কোলাহল

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

আরতি এজেন্সী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—দুই টাকা বারো আনা—

আরতি এজেন্সী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅনাথনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিমিটেড ৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

প্রবোধকুমার সান্যাল-

করকমলে

—এই লেখকের—

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্

ভাড়াটে বাড়ী

নববধূ

মনে ছিল আশা

পুরুষ ও রমণী

বহু বিচিত্র

দুর্ঘটনা

রজনীগন্ধা

স্বর্ণমুকুর

নবযৌবন

রাত্রির তপস্যা

পৃথিবীর ইতিহাস

অসমাপ্ত

প্রায় তিন ক্রোশ পথ হেঁটে বিভূতি যখন বাড়ীতে পৌঁছল তখন রাত ন-টা বাজে। এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে এই দীর্ঘপথ একটা ব্যাগ হাতে ক'রে আনা—যে এতকাল কলকাতায় বাস করে এসেছে, তার পক্ষে কষ্টকর বৈ কি! শ্রান্তিতে ওর হাঁটু যেন দুম্‌ড়ে আস্‌ছে—ঘুমে আস্‌ছে চোখের পাতা বুজে, এখন লোকের সঙ্গে কথা কওয়াও পরিশ্রম বলে মনে হয়। তবু ওকে আগে জ্ঞাতি-খুড়ো কেদার মুখুজ্জের বাড়ীই ঢুক্‌তে হ'ল, কারণ তাঁর কাছেই থাকে চাবি।

এতরাত্রে অকস্মাৎ ওকে আস্‌তে দেখে তাঁরা সবাই প্রথমটা চম্‌কে গেলেন, তারপর খুড়িমা উঠ্‌লেন চিৎকার করে কেঁদে। কান্নাটা হঠাৎ থামানো সম্ভব নয় ব'লে, বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিভূতিকে করুণ মুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'ল। কেদারবাবু শুধু কাজের কথাটা পাড়লেন, বললেন, 'তা এখন এখানেই হাত-পা ধুয়ে বিশ্রাম করো বাবাজী, একেবারে খেয়ে দেয়ে বাড়ী যেও।'

বিভূতি কিছুই খেয়ে আসেনি, তবু এখানে এখন বিশ্রাম করা এবং এদের সঙ্গে অনর্গল কথা কওয়া ও অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা মনে হ'তেই ওর অন্তরাত্মা শিউরে উঠ্‌ল, তাড়াতাড়ি জবাব দিলে, 'আজ্ঞে আমি রাণাঘাট থেকে খেয়েই আস্‌ছি, তা ছাড়া অম্বল-মত হয়েছে একটু—এখন জল ছাড়া আর কিছুই খাওয়া চলবে না।'

কেদারবাবুও আর পীড়াপীড়ি করলেন না। পল্লীগ্রামে ন'টার মধ্যেই সকলের খাওয়া চুকে যায় সাধারণত—তাঁদের বাড়ীতেও সেই নিয়ম। এখন খাওয়াতে গেলে আবার গোড়া থেকে সব শুরু করতে হবে। ওর খুড়ীমার কান্নাও স্বাভাবিক নিয়মে থেমে এল, তখন তিনি চাবী আর আলো নিয়ে বিভূতির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, সঙ্গে চল্‌ল তাঁর এক নাত্‌নী, একটা বড় ঘটিতে একঘটি খাবার জল নিয়ে।

খুড়ীমা দোর খুলে, বিছানাটা পেতে, ঘরে ঝাঁট দিয়ে ব্যাপারটাকে চলন-সই ক'রে দিলেন। মাত্র দিন-কতক আগেই তিনি ঘরদোর ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার ক'রে রেখে গেছেন—একথাও বার বার শোনালেন। বিভূতি ইত্যবসরে পুকুর থেকে হাত-পা ধুয়ে এসেছিল, সুতরাং আর অপেক্ষা করবার কোনই কারণ ছিল না, তবুও খুড়ীমা দুই-একটি প্রশ্ন ক'রে তবে বিদায় নিলেন, যাবার সময় আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে তাঁর একটি সুশ্রী বোন্‌ঝি আছে, কালকেই তাকে এখানে আনিয়ে বিভূতিকে দেখিয়ে দেবেন।

ওঁরা চলে যেতে বিভূতি যেন হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচল। দক্ষিণের জানলার ধারে চৌকীর ওপরে টাট্‌কা বিছানা পাতা, বিভূতির সমস্ত সত্তা যেন সেদিকে চেয়ে লালায়িত হয়ে উঠেছে। শ্রান্তিতে তন্দ্রায় সমস্ত স্নায়ু অবশ।...খুড়ীমা উঠোন পেরোবার আগেই ও দোর বন্ধ ক'রে আলোটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।...আঃ! ভাগ্যিস্ খুড়ীমা নিজেই বিবেচনা করে আলোটা রেখে গেছেন, আজ এ ঘরে অন্ধকারে ওর ঘুমোনোও মুস্কিল হ'ত। ওর সঙ্গে-ত একটা দিয়াশলাই পর্য্যন্ত নেই।

দেহ মন ক্লান্ত, এতটা পরিশ্রমের পর নরম বিছানা পাওয়া গেছে, পূবের জানলা দিয়ে মিষ্টি ঝির্‌-ঝিরে হাওয়া বইছে, সমস্ত অবস্থাটাই

ঘুমোনোর পক্ষে অনুকূল—তবুও ওর চোখে কিন্তু তখনই ঘুম এলো না। দূরে, বহুদূরে কোথায় মেঘ ডাকছে, জাঁতা ঘড়-ঘড় করার মত শব্দ, একঘেয়ে ব্যাঙের ডাক্—ছেলেবেলায় এমন দিনে এই সব আওয়াজগুলো ঘুম-পাড়ানী ছড়ার মতই কাজ করত। কলকাতায় মেসের বন্ধ ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে সে বহুদিন কল্পনা করেছে এমনি ব্যাঙ্ ও ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ডাকের দিকে কান পেতে থাকতে থাকতে আবার ও কবে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে, সেই ছেলেবেলার মত।

তবু ঘুম আসে না—

প্রথম আরামের একটা শিথিল অনুভূতিও ক্রমে কেটে আসে, হঠাৎ এক সময় অনুভব করে যে ও মোটেই ঘুমোচ্ছে না—কথাটা ভাবছে। এই বাড়ী-ফেরার অনেক স্বপ্ন ছিল, অনেক কল্পনা। বাল্যকালে বাবা মারা গিয়েছিলেন, কৈশোরে মা—সেই থেকেই একরকম দেশের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। মামাদের চেষ্টায় পরের বাড়ীতে থেকে রাণাঘাটে লেখাপড়া শেখে—ম্যাট্রিক পাশ করার পরই কল্কাতায় গিয়ে চাক্‌রীর চেষ্টা করতে হয়। সেই যে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের অন্ধকারময় সস্তাদরের মেসে বাসা নিয়েছিল, আজও সেখানেই আছে সে; দেশে আসবার প্রয়োজনও হয় নি, উপায়ও ছিল না। পঁচিশ টাকা মাইনেতে চাকরীতে ঢুকেছিল—আজ সে মাইনে তেতাল্লিশে পৌঁচেছে, তাই থেকেই সব খরচা চালিয়ে একটা লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে হয়, বাজে খরচের মত কিছুই বাঁচে না।...তবু সে স্বপ্ন দেখেছে, তবু ভেবেছে এই দেশের কথা—একদিন তার হাতে পয়সা জমবে, একদিন সে তার ভাঙা পৈত্রিক

ভিটেতে ঘর তুলবে, সে ঘর সাজাবে আরামের নানা বিচিত্র উপকর দিয়ে। ওর অফিসের সবাই ছুটিতে দেশে যাবার হিসেব করং পূজো-বড়দিনের আগে—ওর তখন বিশ্রী লাগ্‌ত। দেশ একটা থাক চাই বৈকি! উদার-বিস্তৃতি, মাঠ-বাগান-গাছপালা—নিজের বাড়ী পরের বাড়ীর দেওয়াল যেখানে আকাশ আড়াল ক'রে দাঁড়াবে না পরের উনুনের ধেঁাওয়া যেখানে নিঃশ্বাস রোধ করবে না।

কিন্তু স্বপ্ন বোধ হয় স্বপ্নই থাকৃত—যদি না দৈবাৎ তার বিয়েট হয়ে যেত। সে যেন সবটাই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অকস্মাৎ ও মামা একখানা চিঠি দিলেন, 'বিশেষ দরকার—তিনচার দিনের ছু নিয়ে এস।' কী এমন দরকার থাকতে পারে তাঁর, কিছুতেই ভে পেলে না বিভূতি। দিদিমা মারা যাওয়ার পর থেকে মামার বাড়ী বন্ধন ক্রমে শিথিল হয়েই এসেছে, যাওয়া-আসা চলে কচিৎ-কখনও তবু বড়মামার জরুরী চিঠির ডাক উপেক্ষা করা গেল না, উপকার তাঁরা অনেক করেছেন তাতে ত ভুল নেই।...মামার বাড়ী পৌঁ শুনলে পরের দিন তার বিয়ে। পাত্রী মামীর সম্পর্কে ভাই-ঝি সুতরাং তার মত নেবার প্রয়োজন নেই। বড় মামা রাগ ক' বললেন, 'তোর আবার মত কি? আমি তোর অভিভাবক, আ যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আমার হুকুমই যথেষ্ট।'

আকুল কণ্ঠে বিভূতি বলেছিল, 'কিন্তু মামা, খাওয়াবো কি?'

'পুরুষ মানুষ রোজগার করবি, তাই বলে বিয়ে করবিনি? আমরা ত বিয়ের আগে অতশত ভাবিনি...আপিস ক'রে সকা বিকেল টাইম থাকে ঢের, টিউশনী করতে পারিস্ না—কিংবা ইন্‌সিও রেন্সের দালালী? তা ছাড়া মাইনেও ত বাড়বে।'

মামীমা আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'জীব যিনি দিয়েছেন তিনিই আহার দেবেন—তুই কিছু ভাবিস্‌নি। বড় লক্ষ্মী মেয়ে রে, আমি বলছি তোর ভালই হ'ল। মা-বাপ নেই, চিরদিন কি এমনি বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়াবি, বাসা বাঁধ্‌তে হবে না ?'

কথাগুলি সেদিন খুব খারাপ লাগে নি। আরও ভাল লেগেছিল বিবাহের রাত্রে, মেয়েটিকে দেখে। শ্যামবর্ণ—কিন্তু বড় লাবণ্যবতী মেয়ে, বড় ঠাণ্ডা, বড় মিষ্টি। ষোল বছরের মেয়ে, অর্দ্ধ-বিকশিত শতদলের মতই বিপুল সম্ভাবনা ছিল সে-দিন তার মধ্যে। নামটিও বড় ভাল, কোন্ আধুনিক কবি এই পাড়াগাঁয়ে বসে এমন নাম রেখেছিল কে জানে—সুপ্রিয়া। তারপর ফুলশয্যার রাত্রে সুপ্রিয়ার অন্তরের মাধুর্য্যের সঙ্গে যখন ওর পরিচয় ঘট্‌ল তখন সত্যিই নিজেকে কৃতার্থ মনে করলে বিভূতি। ভবিষ্যতের চিন্তা, অর্থের অস্বচ্ছলতা, সামান্য চাকরী—এ সমস্তই সেদিন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সেই আনন্দের স্রোতে কোথায় ভেসে চলে গেল ; সাতদিনের দিন সে যখন কলকাতায় ফিরল তখন ওর মনের মধ্যে বড় হয়ে রয়েছে শুধু অতি মিষ্টি একখানি মুখ, আর তার কৌতুকভরা ডাগর দুটি চোখের মায়া—

কিন্তু এইবার টাকা রোজগারের সমস্যাটা আরও তীব্র হয়ে উঠ্‌ল। শ্বশুর গরীব মানুষ—তাঁর ঘরে বৌকে ফেলে রাখা বড় লজ্জার কথা। অথচ কল্‌কাতায় বাসা করাও এই আয়ে অসম্ভব। মামা মাস-দুই এনে রাখলেন তাঁদের বাড়ী—তাতে খরচা ঢের বেশী। মামা খোরাকী নেন্‌না—সেই জন্য শনিবার মামার বাড়ী যাবার সময় এটা-ওটা বাজার ক'রে নিয়ে যেতে হয়, গাড়ী ভাড়া সুদ্ধ তাতে অনেক পড়ে। সুপ্রিয়া বাপের বাড়ী থাকলে আরও অসুবিধা, শ্বশুর প্রত্যেক শনিবার নিমন্ত্রণ

করতে পারেন না, তাঁদের অবস্থা খুবই খারাপ—নিমন্ত্রণ না করলেও যেতে সাহসে কুলোয় না, কী জানি যদি বিব্রত করা হয়।

এইভাবে সমস্যার সমুদ্রে যখন সে দিশা খুঁজে পাচ্ছে না, তখন হঠাৎ একদিন সুপ্রিয়াই পথ দেখালে—বললে, 'আচ্ছা—দেশে ত শুনেছি তোমাদের ভিটে এখনও আছে, সেইখানেই একখানা মাটির ঘর তুলে নাও না। শ' দেড়েক টাকা হ'লে একটা ঘর উঠবে না? আমার বালাটা বাঁধা দিয়ে—'

'বিদ্রূপের স্বরে বিভূতি প্রশ্ন করলে, 'তারপর? বালা ছাড়াবে কিসে?'

'না হয় বিক্রী ক'রে দাও! তোমাকেই যদি কাছে না পেলুম, গয়না নিয়ে কি করব?'

'কিন্তু মাটির ঘরে থাকতে পারবে?'

'এখানেই কোন্ পাকা ঘরে আছি?'

'তা বটে—' তবু বিভূতির মন খুঁৎ খুঁৎ করে, 'একা পাড়াগাঁয়ে থাকা—তুমি ছেলেমানুষ, সে কি সম্ভব হবে?

সুপ্রিয়া চটে গেল, 'সব তাইতে তোমার খুঁৎ-কাটা স্বভাব। আমি যখন বলছি থাকতে পারব তখন তোমার কি?…ওখানে ত অনেক কৈবর্ত্তর মেয়ে আছে, কাউকে খেতে দিলেই সে এসে দাওয়ায় শুয়ে থাকবে'খন।…তোমাদের ত শুনেছি বিঘে দু-তিন ধান জমিও আছে, পাঁচভূতে লুটে খাচ্ছে—বাগানের ফসলও কিছু কিছু হবে, আমি গিয়ে থাকলে একটা লোককে খেতে দিতে কি লাগবে? তোমাকে টাকা পাঠাতেও হবে না, আমি এম্‌নি সংসার চালাবো, দেখো।'

পাকা গিন্নীর মতই কথাগুলো বলে সুপ্রিয়া বিজয়-গর্ব্বে স্বামীর

দিকে তাকায়!…এক্ষেত্রে বিভূতির আত্মসমর্পণ ছাড়া কীই বা করবার আছে? সে কল্‌কাতায় ফিরে অনেক তদ্বির-তদারকের পর অফিস থেকেই তিন্‌শ' টাকা ধার পেলে। তারপর ছুটি নিয়ে খুড়োর বাড়ী গিয়ে বসে সত্যি-সত্যিই একদিন এই ঘরখানা তুলে ফেল্‌লে। পুরোনো ভিটের কিছু ইঁট কাজে লেগেছিল—সিমেণ্টের মেজে, কাঁচা গাঁথুনী ইঁটের দেওয়াল আর খড়ের চাল—আধপাকা এই ঘরখানি ও বাইরের দাওয়া সেই টাকার মধ্যেই উঠে গেল। খুড়ো মশাই শুভ দিন দেখে পুত্রবধূকে নিয়ে এলেন—স্থির হ'ল বিভূতি যখন থাকবে না, তখন খুড়ো মশাইয়ের বিধবা মেয়ে টুনী থাক্‌বে সুপ্রিয়ার কাছে; আর ওঁদের বুড়ো চাকর হারাণ শোবে বাইরে। সেদিন বিভূতির মনে হয়েছিল দুঃখের খোলস চিরকালের মতই তার গা থেকে খসে পড়ল এবার। তাদের সংসারের নৌকো স্রোতের ধারা খুঁজে পেয়েছে, তার পালে লাগবে এবার আনন্দের বাতাস—তর্‌ তর্‌ করে কালের ধারা বেয়ে চলে যাবে। কোথাও কোন বাধা, কোন বেদনা আর রইল না!

সে ত এই মাত্র বছরখানেক আগের কথা। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে যেন সে কত কাল, কত যুগ, কত জন্মান্তর আগের কথা। সে যেন স্বপ্ন, তার এ জীবনের সঙ্গেই যেন কোন যোগ নেই।

সংসার পাতবার পর যখন সে কল্‌কাতায় ফিরে গেল তখন সুপ্রিয়াকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হ'লেও একটা নূতন উৎসাহ নিয়ে সে গিয়েছিল। সত্যিসত্যিই সে ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্সি নিলে এবার—টাকা চাই, দেনা শোধ করতে হবে। আসবাব চাই—নতুন ঘর সাজাতে হবে। সকাল থেকে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত অফিসের

সময়টুকু বাদ দিয়ে ঘোরে সে, যেন লাট্টুর মতই। বন্ধুরা বলে 'এত খাটলে মরে যাবে যে বিভূতি!' কিন্তু সে এই ঘোরার জন্য কোন ক্লান্তি বোধ করে না। বেশী রাত হলে অন্য লোক ঘুমিয়ে পড়ে এইতেই তার অসুবিধা, নইলে সে সারা রাতই বোধ হয় কাজ করতে পারত।

ফলে মাস-তিনেকের মধ্যেই অর্দ্ধেক দেনা শোধ করে একটা ছোট আলমারী, একটা বড় আয়না, আলো—এমনি সব সুপ্রিয়ার পছন্দ ও ফরমাস-মত নানারকমের সৌখীন জিনিষ কেনা হ'ল। এ ছাড়া ওর জন্য একটা ঢাকাই সাড়ী—কানের একজোড়া দুলও। এক কথায় সুখ ও সৌভাগ্য ওর জীবনের পাত্রে যেন উপ্‌ছে পড়তে লাগল। বিভূতি মনে করলে বাল্যকাল থেকে দুঃখ দিয়ে এতদিন পরে বিধাতা সদয় হয়েছেন।

তারপরই হঠাৎ বাজ পড়ল—শুধু যে বিনামেঘে তাই নয়, নিঃশব্দেও বটে। একটা মোটা রকমের ইন্‌সিওরেন্সের কেসের আশায় সে মাল্‌দা গিয়েছিল তিন দিনের ছুটি নিয়ে। ভরসা ছিল—এই কেস্‌টা গেঁথে তুলতে পারলে চাকরী ছেড়ে দিলেও চলবে, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী থেকেই একটা মাসিক মাইনের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। হ'লও তাই শেষ পর্য্যন্ত, শুধু, মাল্‌দা থেকে ফিরে শুন্‌লে যার জন্য এত অর্থের প্রয়োজন, সে-ই আর নেই। পা পিছ্‌লে দাওয়ায় পড়ে গিয়ে চোট লাগে—ব্যাপারটা সামান্যই মনে হয়েছিল প্রথমে কিন্তু তাইতেই আন্তরিক রক্তস্রাব হয়ে সুপ্রিয়া মারা গেছে। ওকে খবর দেবার জন্য লোক এসেছিল কলকাতায়—কিন্তু সেই দিনই সে মালদা চলে গেছে—অর্থাৎ মৃতদেহটাও দেখতে পাবার আর

কোন আশা নেই। তার নতুন বৌ, তার সুপ্রিয়া, তার প্রিয়তমার—আর কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই, শ্মশান খুঁজলে এক মুষ্টি ছাই মিল্‌বে কিনা সন্দেহ !

বিভূতি আর শুয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না। কি একটা যেন অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠে পড়ল, আলোটা বাড়িয়ে তাকের কাছে এসে হাত-ঘড়িটা দেখলে, রাত বারোটা বাজে। তার মানে দু'ঘণ্টার ওপর সে শুয়ে আছে বিছানায়, তবু ওর চোখে ঘুমের আভাস পর্য্যন্ত নামেনি।

ঘড়িটা রেখে দিয়ে তাকের সামনেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। ও খবরের পর সে আর এখানে ফেরেনি, ফির্‌তে ইচ্ছা হয়নি। খুড়ো মশাই অনেকগুলো চিঠি দিয়েছিলেন, লোকও পাঠিয়েছিলেন তবু বিভূতিকে আন্‌তে পারা যায়নি। অনেক সাধ করে এ স্বর্গ যে সাজিয়েছিল সে-ই যখন নেই, কার জন্য বিভূতি এখানে আস্‌বে, শূন্য ঘরে কাঁদতে আসবে? তার আর প্রয়োজন নেই। কান্নাও তার আর ছিল না—বাজের আগুনে ওর ভেতরটা পুড়ে গেছে, চেষ্টা করলেও বোধ হয় চোখে জল বেরোবে না।

তাকের শেল্‌ফ্‌গুলোর দিকে ভাল করে তাকাতেই ওর যেন অনেকক্ষণের একটা আচ্ছন্ন ভাব চম্‌কে ভেঙ্গে গেল। আশ্চর্য্য, সুপ্রিয়ার নিত্য ব্যবহারের জিনিষগুলো এখনও তেম্‌নি ছড়ানো আছে, যেমন থাকৃত সে থাক্‌লে! কেউ সরায়নি, গুছিয়েও রাখেনি। ওর চুলের দড়ি, কাঁটা, পাউডারের কৌটো, সিঁদুর কৌটো—সব, মায় গন্ধ তেলের শিশিতে আধশিশি তেল পর্য্যন্ত। বিহ্বল, মূঢ় দৃষ্টিতে সেদিকে

চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন ওর মনে হ'ল সুপ্রিয়া বেঁচে আছে,—এখানেই আছে—হয়ত ঘাটে কিংবা রান্নাঘরে গেছে কী কাজে।

কিন্তু—

চুলের দড়িটায় হাত দিতে গিয়েও কেমন যেন শিউরে উঠে বিভূতি হাত সরিয়ে নিলে। ওর মধ্যে স্পর্শ আছে, তার দেহের স্পর্শ, তার সেই নিবিড় চুলের স্পর্শ। তাদের কত প্রণয়-বিহ্বল রজনীর সাক্ষী আছে ঐগুলো—না, ও গুলোতে সে হাত দিতে পারবে না! তার দেহের খানিকটা আভাস পেয়ে বাকীটা না পেলে—না, না, সে অসম্ভব।

আলোটা তুলে এনে দেরাজটার ওপর রাখলে সে। এইবার বেশ আলো হয়েছে, সব কটা শেল্‌ফই ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে। কী একটা লেস বুনতে আরম্ভ করেছিল, তার খানিকটা সুতোর গুলি এবং ক্রুশ-কাঠি সুদ্ধ ধুলোয় পড়ে রয়েছে। ওপরের তাকে কতকগুলো ভাঁড়ারের জিনিষ। তার মধ্যে চা আর চিনির কৌটোটা বিভূতির পরিচিত। আরও কত কি খুঁটি নাটি। প্রত্যেকটিতেই তার হাতের ছোঁয়া লেগে আছে এখনও—সে শেষ হাত দেওয়ার পর এখনও পর্য্যন্ত হয়ত অন্য কোন হাত ঠেকেইনি তাদের গায়ে।···আশ্চর্য্য, সব আছে, শুধু সে-ই নেই!

চোখ ঘুরে ঘুরে সহসা চাবির গোছাতে এসে থামল। চাবির রিংটা ছিল ওর বড় প্রিয়, ওর নাকি ছেলেবেলা থেকে সখ্ চাবি আঁচলে বাঁধা থাকবে, কাজে-অকাজে ঘুরতে ফিরতে আঁচলটা ঘুরিয়ে পিঠে ফেল্‌বে—সেই ঝম্ ঝম শব্দটাতে ওর লোভ।···চাবিটার দিকে চোখ পড়তেই দেরাজটার কথা মনে হ'ল। তার নিজের হাতে

সাজানো সব, দেরাজ, আলমারী যা কিছু। এ দেখা যন্ত্রণাদায়ক সন্দেহ নেই, তবু বিভূতির কী একটা কৌতূহল অসম্বরণীয় হয়ে উঠেছে। দেখতেই হবে ওকে, ঠিক তার যাবার আগে কি ভাবে সাজানো ছিল; শুধু তার হাতের নয়—মনের স্পর্শও রয়েছে ওদের মধ্যে, এতদিন পরে সে যেন নিবিড়ভাবে সেই পরশটুকুই অনুভব করতে চায়। শেষ দেখা ওদের হ'ল না, কথা রয়ে গেল অসমাপ্ত—সেই অসম্পূর্ণ, হঠাৎ থেমে যাওয়া প্রাণের বাণীটিই সে আহরণ করতে চায় এর মধ্যে থেকে।

ওর পকেটেও একটা চাবির রিং আছে, এই গুলোরই ডুপ্লিকেট্ চাবী সে নিজের কাছে রেখে ছিল—বরাবরই বিভূতির ভয়, কোন্ দিন নাইতে গিয়ে পুকুরে রিং হারিয়ে আসবে সুপ্রিয়া। সে পকেট হাত্‌ড়ে সেই চাবিটাই বার ক'রে দেরাজ খুলে ফেললে। সুপ্রিয়ার চাবিতে হাত দিতে পারলে না—তার ছোঁয়াটুকু সে চায় বটে, কিন্তু অন্তরের স্পর্শতেই ওর আগ্রহ বেশী, ঠিক মৃত্যুর আগে তার দেহের স্পর্শ যে গুলোতে লেগে আছে, সেগুলো ছোঁবার সাহস যেন নেই—ছুঁতে গেলে ভয়ে নয়, আবেগে ওর বুক কেঁপে ওঠে।

দেরাজের ওপরের টানাটাতে সুপ্রিয়ার টাকাকড়ি থাকৃত। এখন তার বিশেষ কিছুই নেই—কারণ নগদ টাকা ওর শেষকৃত্যে খরচা হয়েছে; গহনা সামান্য যা-কিছু ছিল, খুড়ো মশায় নিয়ে গিয়ে রেখেছেন তাঁর কাছে। এখন পড়ে আছে কতকগুলো খুচ্‌রো রেজকী আর টাকাখানেকের ওপর হবে বোধ হয় আধলা। আধলা জমানো ছিল ওর একটা নেশা। বিড়ি কেনার কিংবা বাজার করার ফেরৎ আধ্‌লা দেখলেই সে কেড়ে নেবে। নিতান্ত দরকার পড়লে দু-একটা খরচ করত,

বড্ড জোর ভিক্ষে দিতে—নইলে সবই জমত।...ওপাশে একটা সিল্কের রুমাল, এখনও তাতে এসেন্সের আভাস লেগে আছে, একটা রূপোর সিঁদুর কৌটো, তার ব্যবহারের নয়—বিয়ের সময় পাওয়া। দুটো ভাল কাপ-ডিস্, খানিকটা ফরসা ন্যাকড়া, লাল ফিতে, এক তাড়া পুরোনো চিঠি, একজোড়া তাস—আর একটা চিঠির কাগজের প্যাড্।

প্যাড্‌টা দেখে ওর বুকটা যেন ধড়াস ক'রে উঠ্‌ল। যদি দু'লাইনও ওতে লেখা থাকৃত, এমন একখানা চিঠি যা ডাকে দেওয়া হয়নি, যা সে পড়েনি! ওর মনে হ'ত তা হ'লে মৃত্যুর পরপার থেকেও তার চিঠি এসে পৌঁচেছে। সত্যি-সত্যিই তা হ'লে তার সঙ্গে আজ, এতদিন পরেও যোগসূত্র স্থাপিত হ'ত।

খুলে দেখবে সে? যদি লেখা থাকে? কিন্তু সাহসে যেন কুলোয় না—যে তীব্র আশা ও আকাঙ্ক্ষায় ওর বুক কাঁপছে তা যদি ব্যর্থ হয়? সে আশাভঙ্গের বেদনা সুপ্রিয়াকে হারাবার ব্যথাকেই নূতুন করে জাগিয়ে তুলবে ওর মনে।

অনেকক্ষণ সে প্যাড্‌টার দিকে চেয়ে বসে রইল। মনকে বোঝালে বার-বার—যে চিঠি না থাকবার সম্ভাবনাই বেশী। চিঠি ছাড়া লিখলে সে ডাকে দেবে না কেন? তা যদি না-ই ডাকে দিতে পেরে থাকে সে, খুড়ো মশাইরা ত ছিলেন, তাঁরাও পাঠিয়ে দিতেন তা হ'লে। অতএব কোন চিঠি পাবার আশা না করাই উচিত। প্যাডের মলাট উল্‌টে দেখবারও প্রয়োজন নেই।

তবু শেষ পর্য্যন্ত সে প্যাডখানা হাতে তুলে নিলে—এবং মলাটটা সরাতেই ওর বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠ্‌ল। লেখা আছে, সত্যিই লেখা

আছে। এ তারই হাঁতের লেখা, সব কটা অক্ষর কাঁচা, লাইন বাঁকা—যেমন চিঠি সে অসংখ্য পেয়েছে কলকাতার বাসায়, যে চিঠির বাণ্ডিল সে স্যুটকেসে করে ভরে এনেছে—এ তেম্‌নিই আর একটি চিঠি।

প্যাড্‌টা আর আলোটা হাতে ক'রে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে এসে বিভূতি বিছানায় বসে পড়ল। না জানি কি লেখা আছে ওতে, কী না জানি সে বল্‌তে চেয়েছিল, বলা হয়নি। মরবার আগেই লেখা নিশ্চয়, তবু এটা ত ঠিক, ও পাচ্ছে সেটা আজ—এ যেন স্বর্গ থেকেই তাকে পাঠানো চিঠি।

হঠাৎ ওর মনে হ'ল যদি চিঠিটা আর কাউকে লেখা হয়? সুপ্রিয়ার বাবাকে, কিংবা মাকে? খুলে দেখবারও সাহস নেই ওর—কতরকমের আবেগ আর আশঙ্কা ওকে যেন জড় ক'রে দিয়েছে।

অবশ্য এক সময় খুলতেই হ'ল প্যাড্‌টা। অসম্পূর্ণ চিঠি, সেই জন্মই ডাকে দেওয়া হয়নি। লিখ্‌তে লিখ্‌তে বোধ হয় কী কাজে চলে গিয়েছিল। না, চিঠিটা ওকেই লেখা বটে। লিখ্‌ছে-

শ্রীচরণকমলেষু—

ওগো স্বামী মশাই, মনে হচ্ছে কতকাল তোমাকে দেখিনি। মোটে ত এক হপ্তা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এক যুগ। কাল থেকে বড্ড তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করছে। চলে এসোনা বাপু, কী কল্লো কলকাতায়? কাল রাত্রে তোমার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই ঘুমিয়েছি কিনা, স্বপ্ন দেখেছি যেন তোমার পাশেই শুয়ে আছি, তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরতে গিয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি ওমা, ঠাকুরঝি! মেজ ঠাকুরঝি কি মনে করলে কে জানে!

তুমি কবে আসবে, শনিবার আস্‌ছ ত? বেনের দোকান থেকে

এবার আমার জন্যে এক তাড়া পাতা-আল্‌তা এনো ত, শিশির আল্‌তা রোজ পরতে ভাল লাগে না।

হ্যাঁ, ছাখো, তোমাকে একটা কথা বল্‌ব আজ। কথাটা সেই বিয়ের সময় থেকেই জানাবো জানাবো মনে করি, সাহসে আর কুলোয়না কিছুতে, মনে হয় যদি রাগ করো, যদি আমার ওপর ভালবাসা আর না থাকে! অথচ তোমার কাছে কোন কথা লুঁকিয়ে রাখতে আমার একদম ইচ্ছে করে না। বলো রাগ করবেনা? লক্ষীটি! আজ তোমাকে কথাটা লিখব বলে সকাল থেকে প্রতিজ্ঞা ক'রে রেখেছি, কিন্তু এখন লিখ্‌তে ব'সে কেমন যেন ভয় করছে, তুমি কি মনে করবে কে জানে!

তবু বলেই ফেলি। তোমার কাছে না বললেও আমার শান্তি নেই। কথাটা আর কিছু নয়—

এই পর্য্যন্ত চিঠি। বোধ হয় তখনও সঙ্কোচে বেধেছিল বলেই আসল কথাটা লেখ্‌বার আগে প্যাড্‌টা দেরাজে তুলে রেখে দিয়েছিল পরে লিখ্‌বে বলে—আর লেখার সময় হয় নি। তারিখ নেই চিঠিতে, হয়ত সেইদিনই সে পড়ে গিয়েছিল, প্যাড্‌টা রেখে বাইরে যেতে গিয়েই পড়ে গিয়েছিল, শেষটুকু লেখা আর সম্ভব হয়নি।

কিন্তু কী এমন কথা? যা লিখতে সুপ্রিয়ার এত সঙ্কোচ, এত ভয়? আকাশ-পাতাল ভেবেও সে বুঝতে পারলে না যে এমন কি কথা তার থাকতে পারে, যাতে ওর ভালবাসা হারাবার পর্য্যন্ত ভয় হয়!

তবে কি ও কিছু হারিয়ে ফেলেছিল, গয়না বা ঐ-রকম দামী কিছু?

না কি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করেছিল ?...তাই বা কেমন ক'রে হবে, সে যে লিখছে 'কথাটা বিয়ের সময় থেকেই জানাবো জানাবো মনে করছি' !

বিভূতি অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াল। জীবনের অপর পার থেকে চিঠি পাবার কথা ভাবছিল সে, তাই বুঝি ভগবান তাকে এমন বিদ্রূপ করলেন ! কোন উপায় নেই, কোন প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। কী যে সে বলতে চেয়েছিল, কী কথা ছিল তার মনে এতকাল ধরে লুকোনো, কী রহস্য রইল অবগুণ্ঠিত হয়ে—তা এ জন্মে জানবার আর কোন উপায় রইল না। মাথা খুঁড়লেও না।...জন্মান্তরেও জানা যাবে কিনা সন্দেহ।

একবার সে জোর করে মনকে প্রবোধ দিলে, যা বলা হ'ল না, যা জানা গেল না তা নিয়ে আর এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ কি ? যার কথা—সে-ই যখন নেই, কী হবে তা জেনে ? আর ত কোন কাজেই আসবে না। তার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ, সমস্ত সম্পর্কই যখন ঘুচে গেছে, তখন এটুকুর জন্যে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। যে রহস্যই থাক—ছিল তাকে ঘিরে, আজ আর সে না-বলা কথা, সে রহস্যের মূল্য কি ?

আলোটা আবার কমিয়ে দরজার কাছে রেখে বিভূতি শুয়ে পড়ল। এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতে হবে, শুধু শুধু রাত জেগে লাভ নেই—

কিন্তু ঘুম এলোনা কিছুতেই। কী এমন কথা ছিল ? কিছুতেই কি জানা যায় না ? ওগো, অন্তত একটুখানি আরম্ভ ক'রে রেখে গেলে

না কেন, কোন্ বিষয়ে কথাটা জানলেও যে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত! তবে কি ওর কিছু কেনবার ইচ্ছে ছিল? কোন গয়নাগাঁটি? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে—কোন গয়না চাই কিনা, কিছু পরতে ইচ্ছে করে কিনা, বিভূতি ত কতদিন জিজ্ঞাসা করেছে। কানের পাশার কথা ত সে-ই বলেছিল, কোন রকম ভয় বা সঙ্কোচ ত করেনি!

আচ্ছা, কথাটা কী বিষয়-ঘেঁষা হতে পারে?

অত্যন্ত গোপনে, নিজের মনের অবচেতন অবস্থায় একটা কুটিল সংশয় বার বার মাথা তোল্‌বার চেষ্টা করছিল, প্রত্যেকবারই সে জোর ক'রে পিছন ফিরছিল তার দিকে।...কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এক সময় প্রশ্নটাকে মেনে নিতেই হ'ল। সেই একটি মুহূর্ত্তের যন্ত্রণা অবর্ণনীয়। সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত প্রেম, দাম্পত্য-জীবনের সমস্ত মাধুর্য্যরস—এমন কি চিরবিচ্ছেদের সমস্ত হাহাকারের মূলে যেন প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে গেল সেই প্রশ্ন—সেই মর্ম্মান্তিক সংশয়।...অকস্মাৎ বিভূতির মনে হ'ল ওর যেন কণ্ঠ রোধ ক'রে ধরেছে কে, নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে—ডোব্‌বার সময় মানুষ যেমন প্রাণপণে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করে, ঠিক তেম্‌নি ভাবেই ছট্‌ ফট্‌ ক'রে উঠে বসল ও। আশ্চর্য্য, বোধ হয় এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠ্‌ল বিভূতি।

তবে কি ওদের বিবাহের পূর্ব্বেকার কোন ইতিহাস ছিল সুপ্রিয়ার? ষোল বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল, এখনকার হিসেবে বালিকাই—কিন্তু তবু ইতিহাস থাকা যে অসম্ভব নয় তা বিভূতি জানে। বহু কাহিনীই জানে সে বহু বালিকার।

ওদের দাম্পত্য-জীবনের অসংখ্য মধুর স্মৃতি, প্রণয়বিহ্বল মুহূর্ত্তগুলির অগণিত চিত্র ওর চোখের সাম্‌নে দিয়ে ভেসে গেল—সুপ্রিয়ার প্রতিটি

কথা, প্রতিটি চাহনি যেন একসঙ্গে প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌ল—না, না; এ অসম্ভব!

অথচ, তা নইলে ঐ চিঠির কথাগুলোর আর কি অর্থ হ'তে পারে! বিয়ের সময় থেকেই যা বলতে চেয়েছিল সে, স্বামীর ভালবাসা হারাবার ভয়ে সাহস ক'রে বল্‌তে পারেনি—সে কথা এ ছাড়া আর কী-ই বা হ'তে পারে? কী এমন অপরাধ তার পক্ষে আর করা সম্ভব?

হয়ত—এই দু'বৎসরের ঘনিষ্ঠতার ফলে সুপ্রিয়া তাকে সত্যিই ভালবেসেছিল, আর তা বেসেছিল ব'লেই অপরাধটা স্বীকার ক'রে নিজেদের সম্পর্ককে নির্ম্মল করতে চেয়েছিল কিন্তু সে অপরাধ কতখানি তা কে বলে দেবে? কে জানে ওর পূর্ব্ব-প্রণয়ের সুর ওর মনে বিবাহের পরেও ছিল কিনা!

এক কি একাধিক তাও জানা নেই, ধরে নেওয়া গেল একই। কিন্তু প্রথম কৈশোরের আবেগ-বিহ্বল হৃদয়ে প্রথম যে ছাপ পড়েছিল তা কি সহজে যাওয়া সম্ভব? তবে, তবে কি সুপ্রিয়া প্রথম কয়েক-মাস ওর সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করেছে?

বিভূতি চিৎকার ক'রে উঠ্‌তে চাইল কিন্তু স্বর ফুটল না। শুধু ওর মনে হ'তে লাগ্‌ল ঘরটা বড় ছোট, হাওয়া নেই কোথাও ঘরের ভেতর। দেওয়াল গুলো যেন চেপে ধরতে চাইছে ওকে চারদিক থেকে।

ওর মনে পড়ল, বিয়ের পর কল্‌কাতা থেকে প্রথম যেবার ও শ্বশুর-বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে যায়, শেষ রাত্রে ওর হাতে মাথা রেখে ওরই বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সুপ্রিয়া বলেছিল, 'ওগো দ্যাখো, বিয়ের আগে মনে হ'ত আমি আমার মাকে যেমন ভালবাসি এমন আর কাউকে

কোনদিন বাসিনি। আজ তোমাকে ভালবেসে বুঝতে পেরেছি যে ভালবাসা কাকে বলে। এতদিন কাউকেই ভালবাসিনি!'

এ সব কি তবে আগাগোড়া মিথ্যা? সব অভিনয়!...কী প্রয়োজন ছিল তার এত কথা বানিয়ে বলার, সে-ত শুনতে চায়নি।

বিভূতি পাগলের মত আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর দুই চোখ এরই মধ্যে জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি হয়েছে উদ্‌ভ্রান্ত। আপন মনেই ও ব'লে উঠ্‌ল, 'ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—ব'লে দাও এ কথা সত্য কিনা।'

সুপ্রিয়ার একটা ছবি পর্য্যন্ত ঘরে নেই। তোলাবার খুব ইচ্ছা ছিল তার কিন্তু পাড়াগাঁয়ে যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি। তবু, ওর সেই নিত্য ব্যবহারের জিনিষগুলোর দিকে তাকিয়েই বিভূতি বার বার প্রশ্ন করতে লাগ্‌ল, চুপি চুপি, 'ওগো, তুমি আমাকে এতকাল ঠকিয়েছ? তুমি?...এ কি সত্যি! বলো মিছে কথা, বলো লক্ষ্মিটি! বলো আর কি বল্‌তে চেয়েছিলে?—'

চুলের দড়ি আর কাঁটা যেন ওর আকুলতাকে নিঃশব্দে বিদ্রূপ করতে থাকে! হাত-ঘড়িটার আওয়াজ হয় টিক্ টিক্, টিক্ টিক্।

কিন্তু মিছে কেমন ক'রে হবে? ওর উত্তেজিত, উত্তপ্ত, সন্দিগ্ধ মস্তিষ্কে আর কোন সম্ভাবনাই ঢোকে না। বিহ্বল মনে সেই একটা কথাই বার-বার জাগে—সুপ্রিয়া আমার সঙ্গে অভিনয় করেছে? সুপ্রিয়া, যাকে সত্যকারের অপরাধ বলে, তা করেছে কিনা, সে কথাটা যেন বিভূতির কাছে বড় কথা নয়—যে প্রেম-নিবেদন, যে চুম্বন, যে আকুলতাকে ও নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছিল শুদ্ধমাত্র ওরই প্রাপ্য জেনে, তার মধ্যে বিরাট একটা ফাঁকির সম্ভাবনাতেই যেন ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

কোলাহল

অকস্মাৎ—এম্‌নি একটা উন্মত্ত মুহূর্ত্তে ও তাকের ওপর থেকে সুপ্রিয়ার প্রসাধনের সেই সমস্ত জিনিষগুলো জড়ো ক'রে হাতে তুলে নিলে, তারপর দোর খুলে অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়ে ছুঁড়ে সেগুলো ফেলে দিলে পুকুরের জলে। যাক্—যাক্, অবিশ্বাসিনীর সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যাক্—

পুকুরের জলে পড়ে একটি মাত্র শব্দ হ'ল—ঝপ্ করে, নিস্তব্ধ রাত্রির নিঃশব্দ সমুদ্রে একটি মাত্র শব্দের ঢেউ উঠ্‌ল। আর তাইতেই যেন চমক ভাঙ্‌ল বিভূতির। সঙ্গে সঙ্গে ওর দৃষ্টির সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ল সুশ্রী একটি মুখের উদ্বিগ্ন চাহনি। এর ঠিক আগে যেবার বাড়ী আসে সে, সুপ্রিয়া ওর বুকে মাথা গুঁজে বার-বার বলেছিল, 'সত্যি বল্‌ছি তোমার চেহারা এবার খারাপ দেখাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই অতিরিক্ত পরিশ্রম করছ।...ঠিক ক'রে বলো, মাইরি, আমার মাথা খাও—অসুখ বিসুখ করেনি ত? শরীর খারাপ বোধ হয় না?...কি হবে বাপু এত খেটে—টাকার আমার দরকার নেই। শোন, জমি যা আছে আমাদের দু'জনের মত ধান ত হয়, আমার এই যা ক্ষুদ-কুঁড়ো আছে বেচে দিয়ে আর বিঘে-পাঁচেক জমি কিনে নাও—তাইতেই আমাদের বেশ চলে যাবে। তাই করো লক্ষ্মীটি!'

এ কি সব অভিনয়? ঐটুকু মেয়ে, এত অভিনয় করা কি সম্ভব তার পক্ষে! কতদিন কত রাত্রির অসংখ্য আকুলতার স্মৃতি যেন এক সঙ্গে ওর মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌ল। ও বলে উঠ্‌ল, 'না, না, তা সম্ভব নয়। তা হ'তে পারে না! সুপ্রিয়া, আমি জানি তা হ'তে পারে না।'

ঘরের বাইরে সেই নিবিড় অন্ধকারে ঝকঝকে তারাগুলো যেন বিদ্রূপ ক'রে হেসে উঠল। বিভূতি সেদিকে মূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগ্‌ল, 'আচ্ছা, কথায় কথায় নানারকম কৌতুক করা ছিল তার স্বভাব, এও তেম্‌নি একটা কৌতুকের ভূমিকা নয় তো? নানারকম ভূমিকা ক'রে হয়ত একটা তুচ্ছ কথা বল্‌ত—কিংবা হয়ত এ চিঠিটা এম্‌নি ছেড়ে দিত, পরে বিভূতির অসংখ্য অনুরোধে হয়ত জানাত যে কথাটা একেবারেই ফাঁকা, কোথাও কোন ভিত্তি নেই ওর। ...এমন বহুবার করেছে, ওকে ভয় দেখিয়েছে যে 'বিষম একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি, তুমি কিন্তু বকৃতে পাবে না'—ইত্যাদি—তারপর দেখা গেছে যে সে অন্যায়টা আর কিছু নয়, গোটা-কতক কাঁচা আম খেয়েছে নুন দিয়ে!

হাস্যে-পরিহাসে-সেবায়-প্রেমে উজ্জ্বল সেই কিশোরীর মূর্ত্তি সেই মুহূর্ত্তে যেন অপূর্ব্ব এক দ্যুতিতে ওর চিত্তে প্রকাশ পেলে। তার মধ্যে ত কোন মালিন্য, কোন ছলনার স্থান নেই! তবে? এই সংশয় সামান্য সময়টুকুর জন্য প্রকাশ ক'রেই বিভূতি অপরাধী হ'ল না ত?

ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে স্যুটকেসটাকে টেনে বার করলে চৌকীর নীচে থেকে। ওর ভেতরে আছে একতাড়া চিঠি, সবকটাই সুপ্রিয়ার। এই চিঠিগুলোই এখন তার সম্বল, সর্ব্বদাই সেগুলোকে কাছে কাছে রাখে। হয়ত এ আকুলতা থাকবে না বেশি দিন, এ বেদনাও আস্‌বে কমে—এমন কি হয়ত কোন সুদূর ভবিষ্যতে আবার বিবাহ করাও অসম্ভব নয়, তবু এখন এইগুলোই তার নিত্যসঙ্গী, প্রতিরাত্রে অন্তত সে পাঁচ ছ'খানা ক'রে চিঠি পড়ে। মনে হয় সেই সময়ে সুপ্রিয়া তার সঙ্গে কথা কইছে—

আজও সে চিঠিগুলো একটার পর একটা পড়ে যেতে লাগল। সরল, সহজ ভাষা, ভালবাসায়ও সহজ অভিব্যক্তি। অফুরন্ত প্রাণরসের চিহ্ন শুধু তার ছত্রে ছত্রে—জগৎ সম্বন্ধে কৌতুক ও কৌতূহলের অবধি নেই। নিতান্তই ছেলেমানুষ, এর মধ্যে অভিনয় সন্দেহ করেছিল সে? ছিঃ!

কিন্তু চিঠিগুলো যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন সেগুলোকে আবার বাণ্ডিল বেঁধে তুলে রাখবার কথা মনে রইল না। খাম আর কাগজ-গুলো তেমনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে রইল, তারই মধ্যে আলোটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে সেই কথাটাই ভাবতে লাগল বিভূতি—সত্যি, কী বলবার ছিল ওর, এমন কি কথা? যদি এটা ওর ঠাট্টা না হয়, যদি সত্যিসত্যিই কোন অন্যায় ক'রে থাকে ও—কি সে অন্যায়, কী রহস্য ছিল ওর মনে এতদিন? স্বামীর আলিঙ্গনের মধ্যে শুয়ে থেকে, তার ভালবাসার সহস্র নিদর্শন পেয়েও যা সাহস করে বলতে পারেনি সুপ্রিয়া!

কে এ কথার উত্তর দেবে? কোন উপায় নেই জানবার। চির-দিনের মতই থাকবে শুধু প্রশ্ন।

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার পাণ্ডুর হয়ে এল—ধীরে ধীরে ফরসা হয়ে এল পূবের আকাশ, হ্যারিকেনের আলো ম্লান হয়ে গেল, তবু বিভূতির চোখে তন্দ্রা নামল না। তেমনিই স্থির হয়ে বসে রইল সে, চারিদিকে ছড়ানো রইল চিঠিগুলো, আলোটা তেমনি জ্বলতে লাগল।

কে জানে হয়ত সারাজীবনেও এ সমস্যার মীমাংসা হবে না—হয়ত বা জন্মান্তরেও না।

লণ্ঠনের ঐ বিবর্ণ শিখাটা আবার রাত্রির অন্ধকারে উজ্জ্বল হয়ে

উঠ্‌বে—কিন্তু তার জীবনের সমস্ত আলো হয়ত চিরদিনের জন্যই বর্ণহীন হয়ে গেল। ওর অন্তর জীবনের যে কয়টি ফলবান মুহূর্তকে অবলম্বন ব'লে আঁকড়ে ধরেছিল, আজ তারা ভোরের আকাশের ঐ তারাগুলোর মতই মিলিয়ে গেল, আর কোনদিন বোধ হয় তাদের দেখা পাওয়া যাবে না।

পঞ্জর

অতীর্শ সাধারণভাবে সমস্ত ধনীলোকের ওপরই চটা ছিল। এটা ওর সাম্যবাদীদের বক্তৃতা শোনার ফল নয়—নিজের স্বভাবজাত বিদ্বেষ। বোধ হয় ছেলেবেলায় ও নিজে ধনী হবার যে স্বপ্ন দেখেছিল, ভবিষ্যতের যে ছবি মনে মনে এঁকেছিল, তার শোচনীয় ব্যর্থতাই এই মনোভাবের জন্য দায়ী।

ছেলেবেলায় ও লেখাপড়া শেখেনি কিন্তু সেটাকেই ও নিজের দুর্দ্দশার কারণ বলে মেনে নিতে চায় না কিছুতে। লেখাপড়া ত কোন মাড়োয়ারীর ছেলেই শেখে না, তার জন্য তাদের বড় ব্যবসায়ী হওয়া আটকায় কি? তার নিজের দেশেও ত দেখেছে, একেবারে অক্ষরপরিচয়হীন 'সাহা'রা—টাকার স্তূপের ওপর বসে আছে। তবে? তবে সে কেন ট্রামের কনডাক্টর হয়েই জীবন অতিবাহিত করবে? ...সে যে ব্যবসায়ী হ'তে পারেনি সেটাকে তার নিজের অক্ষমতা ব'লে মনে করে না—অন্য ধনীলোকদের ষড়যন্ত্রের ফল মনে করে। ঠিক স্পষ্টত কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ওর কিছু নেই, তবে একটা

আব্‌ছা ধারণা ওর মনে আছে যে, মূলধন ও ব্যবসা করার সুযোগ আর কারুর দেওয়া উচিত ছিল ওকে।

দোষ যারই হোক—সুযোগ-সুবিধা ওর মেলেনি, এইটাই সত্য-কথা। তাই লক্ষপতি হয়ে মোটরে ও এরোপ্লেনে চড়ে ঘুরে বেড়ানো ওর সম্ভব হয়নি; এমন কি, একটা ভাল অফিসে চাকরী পর্য্যন্ত জোগাড় করতে পারেনি। লেখাপড়া সে কম শিখেছে বটে, তবু ফার্স্ট ক্লাস পর্য্যন্ত ত পৌঁছেছিল! আরও কম লেখাপড়ায় বহুলোক অফিসে চাকরী করছে—বড়বাবু পর্য্যন্ত হয়েছে। তার পরিচিতই কত লোক এমন আছে। অথচ সে—ওই মাইনেতেই একটা ভাল কাজ কি সে পেতে পারেনা? চেষ্টা সে কম করেনি, ঘুরেছেও বিস্তর। কিন্তু শুধু মুরুব্বির অভাবে কোথাও কিছু পায় নি। আজ সে ট্র্যামের কন্‌ডাক্‌টর। এই চাকরী নেওয়ার মধ্যেই তার অবস্থাপন্ন লোকদের বিরুদ্ধে যেন একটা মস্ত বড় অভিমান ছিল, যদিও সে অভিমানের মূল্য সে কোথাও পায়নি—অতীশ নামক একটি দরিদ্র ভদ্র সন্তানের কি হ'ল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি।

এই প্রতিক্রিয়াটা ওর হয়েছিল খুব জোর। এই কাজটাকে যেদিন সে পুরোপুরি মেনে নিলে সেদিন থেকেই সে বড়লোকদের, পুঁজিবাদীদের, ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জেহাদ্ ঘোষণা করলে। এখন শ্রমিকদের সমস্ত সভায় অতীশ গরম বক্তৃতা দেয়, ট্র্যাম শ্রমিকদের মধ্যে সে রীতিমত পাণ্ডাই হয়ে উঠেছে। ওপর-ও'লাদের গালাগাল ত দেয়ই—তার সহকর্মীদেরও রেহাই দেয় না, তারা বিনা প্রতিবাদে নাকি ওপরও'লাদের জুলুম মেনে নেয়—আর তারি ফলেই তাদের এই দুর্দ্দশা! এখন আর ধনী হবার স্বপ্ন সে দেখে না, এখন তার শুধু

আশা—সে এই সব শ্রমিকদের নেতা হবে, তার মুখের কথায় বড় বড় ধর্ম্মঘট শুরু হবে আবার ভাঙ্গবে, সবাই তাকে সমীহ্ ক'রে চলবে, সরকার করবে ভয়। দুনিয়ার আর পাঁচটা দেশের মত শ্রমিকদের জন্য সমস্ত সুখ-সুবিধা সে আদায় করে নেবে।

কিন্তু এই সমস্তর মধ্যেও কোথায় ওর একটি বিলাসী মন ছিল। মধ্যে মধ্যে একটু নির্জ্জনে থাকতে ওর ভাল লাগে, আর ভাল লাগে খবরের কাগজ পড়তে। সেইজন্য ও আর পাঁচজন কন্‌ডাক্‌টরের সঙ্গে মিলে একটা পাকা ঘরে না থেকে, ছ'টাকা দি... ...কটা খোলার ঘর ভাড়া ক'রে থাকে, আর সময় পেলেই লাইব্রেরী থে... ...বরের কাগজ পড়ে আসে। মেস ক'রে থাকে না ব'লে খাওয়ার অসুবি... হয়, খুচরো হোটেলে ভাত-ডাল কিনে খায়—তাতে পয়সা বেশী লা..., খাওয়াও ভাল হয় না। তবু এই নিজস্ব ঘরের বিলাস ও ত্যাগ কর... ...রে না।

মাইনে সামান্যই—তার সঙ্গে মাগ্‌গী ভাতা-টাতা ...য় যা পায় তাতে এখানের খরচা চালিয়ে কোনমতেই দশটাক... বেশী দেশে পাঠাতে পারে না। ঢাকা জেলার এক গ্রামে ওদের বাড়ী—সেখানে বাপ-মা আছেন, স্ত্রী-পুত্রও আছে। বয়স ওর বেশী নয়, বোধ হয় ছাব্বিশ-সাতাশ হবে কিন্তু অল্প বয়সে বিয়ে করেছিল বলে ইতিমধ্যেই দু'টি ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে। টাকার দরকার তাতে সন্দেহ নেই তবু সেটা উপার্জ্জনের আর কোন চেষ্টাই তার দ্বারা সম্ভব হয়নি—কোন উপায় সে খুঁজে পায়নি। যে উদ্যমহীনতা ওকে ব্যবসায়ী হ'তে দেয়নি—পঁচিশ টাকা মাইনের ট্র্যাম কন্‌ডাক্‌টর ক'রে রেখেছে সেই অক্ষমতাই ওর সামনে উন্নতির সব পথ আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে চিরকাল। *সব চেয়ে মজার কথা এই যে, এখানে চাকরী নিয়েও নিজের জন্মগত*

ভদ্র-সংস্কারকে একেবারে বিদায় দিয়েছে ব'লে মনে করে কিন্তু তার সেই সংস্কারই যে ওকে আর কোন কোন কন্ডাকটরের মত টিকিট না দিয়ে ভাড়ার পয়সাটা নিজস্ব পকেটে তুলতে বাধা দেয়—সেটা বুঝতে পারে না। একটু চেষ্টা করলেই এ থেকে দৈনিক আট-দশ আনা পয়সা স্বচ্ছন্দে কামানো যায়, এমন কি সে কৌশলটা ইচ্ছে করলে ও অন্য লোককে শিখিয়ে পর্য্যন্ত দিতে পারে—তবু নিজে কিছুতেই সেটা করতে পারে না, কোথায় যেন বাধে।

বড়লোকদের ওপর অতীশের রাগটা আরও বেড়েছে ওর এই নূতন ঘরে এসে। তার খোলার চালের ঘরের ঠিক গা ঘেঁসেই দাঁড়িয়ে আছে সরকারী উকিল অরবিন্দ সরকারের বিরাট চারতলা বাড়ী। তা থাক—তারা যদি একটু ভদ্র হ'ত কিংবা একটুখানিও সহানুভূতি সম্পন্ন হ'ত, তাহ'লে ওর অনুযোগ করার কিছু থাকত না কিন্তু তারা যে ওদের, অর্থাৎ যারা তাদের প্রাসাদের পাশে প্রাসাদের কলঙ্কস্বরূপ খোলার ঘরে বাস করছে, তাদের মোটে মানুষের হিসাবেই ধরে না, সেইখানেই যত আপত্তি ওর। মানুষ ত নয়ই—কুকুর-বেড়ালেরও অধম ভাবে বোধ হয়। ওদিকে অন্য পাকাবাড়ী ঢের আছে, বাড়ীর জঞ্জালগুলো সেদিকে ফেলতে বোধ হয় সাহসে কুলোয় না—যত আবর্জ্জনা সব ফেলে অতীশের ঘরের সামনে—ওর সেই অর্দ্ধবর্গ-হাত পরিমাণ জানলার ঠিক নীচেই। একে ত ঐটুকু জানলা, তা-ও এই গরমে বেচারার খুলে রাখবার উপায় নেই, খুললেই চিংড়িমাছের খোলা, ইলিশমাছের আঁশ, কাঁঠালের ভুতুড়ি প্রভৃতি পচার মিলিত সৌরভ (?) নাকে এসে ওকে পাগল ক'রে দেয়।

দু'একদিন বাড়ির চাকরদের ডেকে বলতে গিয়েছিল কিন্তু তাদের দাসত্ব-গৌরব এত বেশী যে তারা কথার উত্তর পর্য্যন্ত দেয়নি। বাবুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হয়েছে। যখনই দারোয়ানকে বলতে গেছে তখনই শুনেছে হয় বাবু শুয়ে আছেন, নয়ত তাঁর মাথা ধরেছে কিংবা মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এ সব কৈফিয়ৎগুলো দারোয়ানকে ভেতরে গিয়ে জেনে আস্‌তেও হয়না। বোধ হয় বেশ-ভূষা দেখ্‌লেই সে বুঝতে পারে যে কী-রকম লোককে বাবুর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া ঠিক হবে। অতীশেরও 'ডিউটি'র ঠিক থাকেনা—বাবু যখন আদালতে যান কিংবা সেখান থেকে ফেরেন তখন গিয়ে ধরবে, সে উপায় থাকে না।

অগত্যা সে ওদের ক্যাশবাবুকে ধরে তাঁকে দিয়ে একখানা দরখাস্ত লিখিয়ে পাঠিয়েছিল কর্পোরেশন অফিসে কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হয়নি। স্যানিটারী ইন্‌স্‌পেক্টর এসে বাবুর ঘরে বসে এক কাপ চা খেয়ে গেছেন—তারপর দু'দিন মোড়ের ডাস্ট্‌বিনের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল, তারপরই জঞ্জালগুলো আবার এসে কায়েমি হয়ে বসেছে ওর জানলার নীচে। উপরন্তু ওর ওপর অত্যাচার উপদ্রব আরও যেন বেড়েছে। অর্দ্ধেক রাত্রে ঠক্ ঠক্ করে পাঁঠার হাড় এসে পড়ে ওর চালের ওপর, কোন-কোন দিন কাজ থেকে ফিরে দোর খুলে দেখে বাইরে থেকে কে বাল্‌তী ক'রে এমন জল ঢেলেছে যে, বন্ধদোরের ফাঁক দিয়ে জল ঢুকে সারা মেঝেতে জমে আছে—বিছানা-পত্র সব গেছে ভিজে! ফলে তার পরের দিনই সে তিনটাকা দিয়ে একটা পুরোনো তক্তপোষ কিন্‌তে বাধ্য হয়েছে। খামাখা খোলার ঘরের লোক তাঁর মত একজন উকিলের নামে কর্পোরেশনে নালিশ করবে,

এ স্পর্দ্ধা মিঃ সরকারের কাছে অসহ্য। তিনি অরবিন্দ সরকার—দুদিন পরে স্যার অরবিন্দ হবারও আশা রাখেন, তাঁর কাছে এ দুঃসাহস ক্ষমার অযোগ্য। ইতিমধ্যে একদিন চারতলার ছাদের ওপরে ঘোলাজলের ট্যাঙ্ক খারাপ হ'ল—সেখান থেকে সেই জলের ধারা দিনরাত পড়তে শুরু হ'ল ওরই খোলার চালের উপর, সে শব্দে রাত্রে ঘুম হয় না, দিনের বেলা ঘরে থাকতে পারেনা। বাড়ীও'লাকে ডেকে বলতে গেল, সে বললে, 'কী করব বলো ভাই—ওরা বড়লোক, ওদের সঙ্গে কি আর দাঙ্গা বাধাবো ?'

অসহিষ্ণু অতীশ বলে, 'কিন্তু তাই ব'লে এই অত্যাচার সহ্য করবে! তোমার খোলার চাল এই জলের তোড় কতক্ষণ সইতে পারবে? ও ত ভেঙ্গে গেল ব'লে। তখন কি হবে ?'

শুক্‌নো মুখে বাড়ীও'লা বলে, 'তাই ত ভাই—কী বলব বলো দেখি! আচ্ছা, দেখি যাই একবার কর্ত্তার কাছে।'

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সে গিয়ে দাঁড়াল। কর্ত্তা ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'তা আমি কি করব? আমি কি নিজে গিয়ে সারাব? মিস্ত্রীকে খবর দিয়েছি সে যদি না আসে!...পারো সারিয়ে দাও—পয়সা দেবো।'

তবু বাড়ীও'লা ভয়ে ভয়ে বলে, 'বাবু আমার খোলাগুলো জখম হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্যই বলা—'

'জখম হয়ে যায় দাম দেবো। যুদ্ধের বাজার, মিস্ত্রী পাওয়া যায় না তা ত বোঝো!'

জখম হয়েছিল ঠিকই, যখন মিস্ত্রী এল সারাতে তখন ঘরের মধ্যে রীতিমত জল পড়তে শুরু হয়েছে কিন্তু তার খেসারৎ দাবী করার

সাহস বাড়ীওয়ালার নেই—সারিয়ে দেবারও সঙ্গতি নেই, ফলে বর্ষায় কষ্ট পেতে হয় অতীশকেই। এ ঘর ছাড়তে পারে না—ঘর পাওয়া যায় না ব'লে। বেশী ভাড়া দেওয়াও অসম্ভব, দেশেতে সবাই একবেলা খেয়ে আছে, এ সংবাদ নিত্যই আসে। ধান যা হয় তাতে ছ'মাসের খোরাকি চলে—বাকী সব ভরসা ওর ঐ দশটাকার ওপর। তা থেকে কমানো যায় না এক পয়সাও। বরং বাড়ানোই উচিত। আজ এক বছর বাড়ী যেতে পারেনি, ছুটি পায়নি বলে নয়,—ঐ খরচটা বাজে খরচা বলে মনে হ । এক মাসের বোনাস হাতে পেয়েও যেতে মন ওঠেনি—মনে ছে যে তারা সেখানে খেতে পায়না, পরনে কাপড় নেই—ছেলেমেয়ে ার চিকিৎসা পর্য্যন্ত হচ্ছে না, গাড়ী ভাড়ার টাকাটা তাদের ঠালে কাজ দেবে। স্ত্রী কান্নাকাটি ক'রে চিঠি দিয়েছিল—ভাল ক বুঝিয়ে উত্তর দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করেছে। আর কিছু আয় না বাড়লে কিংবা খাওয়া-পরার খরচা কিছু না কমলে সাহস হয় না চোদ্দ পনেরো টাকা খরচ করতে!

অথচ উপায়ও কিছু খুঁজে পায় না অতীশ—এমন চাকরী যে, অবসর সময়ে অন্য কোথাও কিছু কাজ করবারও উপায় নেই। সময়ের ঠিক নেই—কোনদিন সকালে, কোনদিন দুপুরে, কোনদিন সন্ধ্যায়। কোথাও কোন পথ খোলা নেই, হয়ত চুরীডাকাতি করলে কিছু হ'তে পারে কিন্তু সে ক্ষমতাও তার নেই। সুতরাং দিনরাত ভাবে নিজের অবস্থার কথা, স্ত্রীপুত্রের কথা—ভবিষ্যতের কথা, আর সমস্ত রাগগুলো গিয়ে পড়ে তাদের ওপর, যাদের খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, ইচ্ছে করলেই যারা ট্রেণে চাপ্তে পারে, বিলাসের উপকরণ

যাদের কাছে সহজলভ্য। আর সেই বড়লোকদের একমাত্র প্রতিনিধি হলেন ওর কাছে উকীল অরবিন্দ সরকার।...এক এক সময় বর্ষা-মুখর রাতে বিছানা গুটিয়ে বসে থাকৃতে. থাকৃতে অন্ধকারে ঘুষি পাকিয়ে নিষ্ফল রোষে সে ফুলতে থাকে, মনে হয় কোন রকম ক'রে সে যদি ভগবানের রচিত এই অসমান ব্যবস্থা ভাঙতে পারত তা হ'লে মরে গেলেও তার দুঃখ নেই। শুধু যদি ঐ অরবিন্দ সরকারটাকে কোন মতে জব্দ করতে পারত, কিংবা—কিংবা অন্য কোন রকম ভাবে শোধ তুলতে পারত!

এই যখন ওর অরবিন্দ সরকার সম্বন্ধে মনোভাব, তখন হঠাৎ একদিন মিঃ সরকারের একমাত্র এবং আদরিণী কন্যার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়ে গেল!

অতীশ থাকে অনেকটা আপন মনেই। ওর গলির কাউকেই প্রায় ও চেনে না—সরকারদের বাড়ীর দিকে চায়ই না ভাল ক'রে। তাই বিপাশাকে দেখতে পেলেও এর আগে লক্ষ্য করেনি। সেদিনও টিকিট দিতে দিতে সে এগিয়েই যাচ্ছিল, তার দিকে ভাল ক'রে চেয়েও দেখ্‌ত না বোধ হয়—যদি না বিপাশাই ব'লে উঠত হঠাৎ, 'ও, আপনি ট্র্যামে কাজ করেন? কী মজা!'

অবাক হয়ে ফিরে তাকাল অতীশ। বছর চৌদ্দ-পনেরোর একটি মেয়ে—হয়ত আরও ছোটই হবে, পরণে ফ্রক, চুল বব্‌ করা, হাতে বই খাতা, বোধ হয় ইস্কুল যাচ্ছে। সমস্ত ধরণটা মেম-সাহেবদের মতো, যা অতীশ দুচোখে দেখতে পারে না। সে কড়া কথাই ব'লে ফেল্‌ত হয়ত কিন্তু বিপাশার মুখের দিকে চেয়ে ওর মনটা নরম হয়ে এল।

সুন্দর নয় তবে সুশ্রী বলা চলে, উজ্জ্বল দুটি চোখ, মুক্তার মত দাঁত—সব চেয়ে যেটা আকর্ষণের সেটা হচ্ছে সরলতা মাখানো মুখভাব এবং সহাস্য দৃষ্টি।

তবু ও ভ্রূকুটি ক'রেই জবাব দিলে, 'মজাটা কি?'

'এই কেমন ট্র্যামে ট্র্যামে ঘুরে বেড়াতে পান—যখন তখন!'

এই এক রকমের বড়মানুষী ন্যাকামী আছে—অতীশের হাড় জ্বালা করে শুনলে! যে পরিশ্রমটা করে ওরা [illegible] দায়ে সেটাকে যে ওরা খুব সহনীয় এমন কি কাম্য ব'লে মনে ক[illegible] এইটে দেখাতে চায় ওরা। সে কঠিন এবং শুষ্ক কণ্ঠে বললে, 'কাজটা তোমাকে করতে হয় না তাই, নইলে বুঝতে পারতে ব্যাপারটা এমন কিছু মজার নয়—বরং কষ্টকর!…আপনার টিকিট?'

পাশের বেঞ্চিতে হাত বাড়িয়ে দিলে অতীশ। ইচ্ছে ক'রেই সে মেয়েটিকে 'তুমি' বললে। বয়সে ছোট তাতে ত সন্দে[illegible] নেই, তবে কিসের খাতির অত!…এতই উষ্ণতা ওর মনে [illegible] হয়েছিল যে মেয়েটি ওকে কবে দেখলে, কোথায় দেখলে এর [illegible]গে, সেটা খোঁজ করবার কথাও মনে হ'ল না।

মেয়েটি ওর অকারণ রূঢ়তায় একটু ম্লান হয়ে গিয়েছিল, সে-ও আর আলাপ জমাবার চেষ্টা করলে না। পাশের যাত্রীগুলি কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে, সেজন্যও কতকটা যেন ওর লজ্জাবোধ করছিল। স্কুলের কাছাকাছি গাড়ী এসে দাঁড়াতেই সে নেমে পড়ল সবার আগে।

আসলে কথাটা হচ্ছে এই যে, সে ইস্কুলের গাড়ীতে এসে চাপে বাড়ীর সামনেই, সেজন্য অতীশের দেখার সুযোগ হয় না বিশেষ। কিন্তু সে গাড়ী ক'রে যেতে যেতে প্রায়ই অতীশকে দেখে যায়।

অতীশ যে ওকে চেনে না, সে সম্ভাবনাটা একবারও বিপাশার মাথায় ঢোকেনি, তাহ'লে সে আলাপ করার চেষ্টাই করত না। অতীশকে সে দেখেছে, কিন্তু সে যে ট্র্যামে কাজ করে তা জানত না। ট্র্যামে চড়ার কারণ তার ঘটে কদাচিৎ, নিতান্ত ইস্কুলের গাড়ী খারাপ হয়ে গেছে ব'লেই আজ চাকরের সঙ্গে সে ট্র্যামে চড়েছে। ট্র্যামে সে চড়েনা বলেই ট্র্যামে চড়াটা তার কাছে অত্যন্ত সুখকর এবং কৌতুকাবহ ব্যাপার ব'লে মনে হয়—আর সেই জন্য তারই গলির অধিবাসী অতীশকে ট্র্যামে কাজ করতে দেখে সে হঠাৎ অত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক্—ব্যাপারটা কিন্তু ঐখানেই মিটল না। সেই দিনই বিকেলে অতীশ ওর ঘরের বাইরের সংকীর্ণ রকে বসে আছে চুপ ক'রে এমন সময়ে বিপাশা ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে ওর সাম্‌না-সাম্‌নি এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। চাকরকে বললে, 'তুই বইগুলো নিয়ে এগিয়ে যা, আমি যাচ্ছি।'

তারপর অতীশের দিকে ফিরে বললে, 'কি করছেন? আজ বিকেলে আর বেরোঁবেন না বুঝি?"

এতক্ষণে সকালের আলাপের যোগাযোগটা অতীশের মাথায় ঢুকল। সে বসে বসে এখন সেই কথাটাই ভাবছিল—মেয়েটিকে এই গলির অধিবাসীরূপে কিন্তু একবারও ভাবতে পারেনি। একটু বিস্মিত হয়েই সে প্রশ্ন করলে, 'আপ—তুমি এই গলিতেই থাকো বুঝি খুকী?'

'আমি আর খুকী নই—এখন বিপাশা!…আপনি কি দেখেননি আমাকে একদিনও? আমি ত পাশের বাড়ীতেই থাকি, বা-রে!'

ট্র্যামের সব আরোহীই যে কন্‌ডাক্‌টরদের 'তুমি' বলে এটা অতীশের বরাবরই অসহ্য লাগে। এই মেয়েটিকে বার বার 'তুমি' বলা সত্ত্বেও সে যে 'আপনি' বলছে তাতে অতীশের মন একটু কোমল হয়ে এসেছিল কিন্তু এখন আবার পাশের বাড়ীর পরিচয়ে সে কঠিন হয়ে উঠল। উদাসীন ভাবে জবাব দিলে, "ও, তাই নাকি? তা হবে!'

বিপাশার চোখ দুটি বিস্ময় ও কৌতুকে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। বললে, 'আপনি আমাকে মোটে চিনতে পারেন নি, না? তাই সকালে অমন কড়া কড়া কথা কইছিলেন। আমি আবার তা ভাবিনি—বরং দুঃখ হচ্ছিল মনে। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলুম।'

তবু অতীশ নরম হ'ল না। তেমনি নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'সেটা আমার ডিউটির সময়—দাঁড়িয়ে আলাপ করবার ত নয়!'

কিন্তু বিপাশা এ উত্তরেও দমল না। বরং অনুতপ্ত ভাবেই বললে 'তা বটে—আমারই অন্যায় হয়েছিল।'

এর পর আর কঠিন হয়ে থাকা সম্ভব নয়। অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবেই অতীশ প্রশ্ন করলে, 'তুমি বুঝি ওবেলা ইস্কুল যাচ্ছিলে? তোমার ইস্কুলের গাড়ী নেই?...'

এবার ওকে চেষ্টা করেই 'তুমি' বলতে হ'ল। 'আপনি'টাই বেরোতে চায় গলা দিয়ে। এর আগে 'তুমি' বলেছে বলে জোর ক'রে এবারও সেই সম্বোধন করলে—অন্য রকম করতে লজ্জা বোধ হ'ল।

কিন্তু এসব গ্রাহ্যই করে না বিপাশা। সে বললে, 'গাড়ী আমাদের খারাপ হয়ে গেছে—দু'তিন দিন আরও লাগবে সেরে আসতে। আমি ত সেই গাড়ীতেই যেতুম—আপনি তাই আমাকে লক্ষ্য করেন নি।

…আমার কিন্তু ট্র্যামে চড়তে ভারি ভাল লাগে।…কাল আপনার কখন ডিউটি, সকালে ?…বেশ হয় যদি কালও আপনার ট্র্যাম ধরতে পারি।'

এবারে অতীশ হেসে ফেললে, 'তা কি আর সম্ভব! কোন্ লাইনে কোন সময়ে থাকব তা কে জানে। ও লাইনে থাকলেও দেখা হবে না। পাঁচ মিনিট অন্তর গাড়ী যায়—আমি কোন্‌টাতে থাকব তা তুমি কেমন ক'রে জানবে বলো!'

'তাইত—কিন্তু হঠাৎ যদি আবার দেখা হয়ে যায়? সে বেশ মজা হবে, না? আচ্ছা, যাই এখন, মা আবার ভাববে—কেমন?'

বিপাশা ওর কাঁধের উপর এলিয়ে-পড়া চুলগুলোয় একটা ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল।

সামান্য পরিচয়, অল্পক্ষণের দেখাশুনো তবু হঠাৎ যেন অতীশের মনে হ'ল ওর সামনে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল, সেটা কে সরিয়ে নিয়ে গেল। তরুণ মনের একটা উত্তাপ যেন এতক্ষণ কাছে ছিল—সেটা কমে গিয়ে স্যাঁৎসেতে পুরাতন এই গলিটা যেন আরও বেশী ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগল। সে জোর ক'রে মিইয়ে পড়া মনটাকে নাড়া দিয়ে নিয়ে একটা বিড়ি ধরালে।

অতীশই আগের দিন বলেছে যে ট্র্যামে ওদের দেখা হওয়া সম্ভব নয়, তবু সাড়ে দশটা নাগাদ ওর মন বার বার চমকে ওঠে দ্বারপ্রান্তে ফ্রকের আভাস দেখে, মন উৎসুক হয়ে থাকে সেই ছোট মুখখানি আর উজ্জ্বল দুটি চোখের জন্য। সে বুঝতেও পারে না যে কি আশায় সে বার বার চাইছে ওদিকে—শুধু সময় এবং স্থানটি পেরিয়ে গেলে কেমন যেন একটু হতাশা বোধ করে।

বিকেলে ওর কোথায় যাবার কথা ছিল, ইউনিয়নেরই কী একটা সভায়। কিন্তু মনে মনেই শরীর খারাপ হবার অজুহাত দিয়ে ও চারটে অবধি পড়ে রইল বিছানায়, তারপর বিড়ি দেশলাই হাতে করে আগের দিনের মতই রকে এসে বসল। ও যে ঐ ফিরিঙ্গী ঢং-য়ের মেয়েটাকে দেখবার জন্যই অপেক্ষা করছে একথা তখন ওকে কেউ বললে অতীশ রীতিমত চটে যেত। ওর বিশ্বাস ও স্বাভাবিক ভাবেই বাইরে বসে বিশ্রাম করছে, ঐ এক ফোঁটা বড়লোকের আদুরে মেয়ের কথা ওর মনেও নেই। কিন্তু মনকে ও যাই বোঝাক্— সাড়ে চারটে নাগাদ গলির মোড় থেকেই চোখোচোখি হ'তে বিপাশার মুখ যখন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তখন অতীশও নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে ও এতক্ষণ বো[illegible] এই হাসিটিরই পথ চেয়ে ছিল।

বিপাশা কাছে এসে বললে, 'জানি দেখা হবে[illegible] তবু ট্র্যামে ওঠবার সময় আজও মনে হচ্ছিল যদি দৈবাৎ আপনা[illegible]্যামটাই কাছে এসে যায় ত কী মজা হয়!'

তারপর অতীশের উত্তর দেবার অপেক্ষা না রেখেই সে এক লাফে রকের ওপর উঠে পড়ে বললে, 'দেখি, আপনার ঘরকন্না দেখে যাই—'

এ সম্ভাবনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলনা অতীশ। ওর দারিদ্র্যের জন্য ও লজ্জিত নয়, তবু কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিপাশা দোরের কাছে থেকেই একবার সবটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'ওমা, আপনি খান কোথায়? কোন মেসে বুঝি?'

'না। হোটেলে খাই।'

'তাহলে ত বড় কষ্ট! হোটেলের খাওয়ায় অসুখ করে, আমাদের রমা-দি বলেন।' চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে বলে বিপাশা।

'কি করি বলো—কে আর রেঁধে দেবে আমাকে।'

'তা বটে।' কণ্ঠস্বর সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ হয়ে আসে বিপাশার, 'এই বিদেশে কি কষ্ট করেই পড়ে থাকতে হয় আপনাকে।...আপনার দেশ কোথায়?'

'ঢাকা।'

'ঢাকা? সে-ত শুনেছি বাঙ্গাল দেশ। কৈ আপনার কথাতে-ত বাঙ্গালে টান নেই তেমন?'

'আছে, তবে অনেক কমিয়ে ফেলেছি ইচ্ছা ক'রে।...তুমি এতক্ষণ আছ, মা ভাববেন না?'

'মার কথা ছেড়ে দিন—আমি বাড়ী থেকে বেরোলেই উনি ভাবতে বসেন। আজ অবিশ্যি এতক্ষণ রামায়ণ-রাসা গেছে—বল্‌বে এখন আমি এখানে আছি।'

'তুমি—তুমি আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছ—ওঁরা বকবেন না?'

'কেন, বকবেন কেন?...তাছাড়া আমাকে বকতে কেউ সাহস করে না। বাবা পর্য্যন্ত ভয় ক'রে চলে আমাকে, তা জানেন? একবার রাগ করে দুদিন খাইনি, সেই থেকে সবাই ঠাণ্ডা।'

কিন্তু সে নেমেই পড়ল। শুধু যাবার সময় বলে গেল, 'আপনার বিছানা ভারি ময়লা হয়েছে—কাচতে দিন।'

তার পরের দিন ফেরবার পথে বিপাশা হঠাৎ ওর পাশেই রকের ওপর বসে পড়ল। অতীশ ওকে যত দেখছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে—মেয়েটা পাগল নাকি? সে বললে, 'হাঁ-হাঁ করো কি, এই ধুলোর ওপর বসতে আছে, ছিঃ!'

বিপাশা বিস্মিত হয়ে বললে, 'কেন, আপনি ত বসেছেন!'

তারপরই হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা আপনি বিড়ি খান কেন? বাবা বলে যে ওতে শরীর খারাপ করে। বাবা খেতো, বুকের অসুখ হতে ছেড়ে দিয়েছে একেবারে।'

অতীশ হেসে বললে, 'তোমার বাবা বড়লোক—ওঁর যত সহজে শরীর খারাপ করে, আমাদের তত সহজে করে না।'

এমনি করে চলল ওদের খুচরো আলাপ। অধিকাংশই বাজে কথা। কী খেলেন—কবে বাড়ী যাবেন—এই সব প্রশ্ন বিপাশার। তবু অতীশের মনে হয় তার এই নিঃসঙ্গ প্রবাসী জীবনে যেন নতুন একটা আলোকের সন্ধান দিয়েছে এই মেয়েটি। কোন দ্বিধা নেই, কোন অভিমান-বোধ নেই—সরল নিষ্পাপ এই মেয়েটির অন্তরের উত্তাপে ওর অনেক দিনের শৈত্য যেন গলে আসে।

কিন্তু পরের দিনই বিপাশাদের গাড়ী সেরে আসে, অতীশেরও ডিউটি পড়ে বিকেলের দিকে—তিন চার দিন দেখা হয় না। তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, আগেও ওর সঙ্গে পরিচয় ছিল না—পরেও থাকবে না, তবু অতীশের মনে হয় দিনটা যেন দীর্ঘতর ঠেকছে—নিঃসঙ্গতা যেন আরও কষ্টদায়ক।

তার এই 'কিছুই ভাল লাগে না' ভাবের কারণ প্রথমটা বুঝতেও পারেনি অতীশ, দিন-দুই পরে হঠাৎ যোগাযোগ খুঁজে পেয়ে নিজের

ওপর অত্যন্ত চটে গেল। বড়লোকের মেয়ের ওপর এত মায়া পড়া কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই—এ সব ওদেরই শয়তানী। ওঁরা দয় ক'রে গরীবদের সঙ্গে কথা কইতে এসে, অমায়িকতা দেখান। এং আত্মীয়তার দরকার কি?…এরপর কোন দিন আবার গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলে অতীশ কিছুতে আর আমল দেবে না!

অতীশ পড়াশুনো বেশী করেনি—নাটক নভেল পড়েছে আরও কম। মেয়েদের প্রতি পুরুষের সহজাত আকর্ষণের মূলটা কোথা তা জানে না। *এটা ওটা গল্প লোকের মুখে শুনে, খবরের কাগজে দু-একটা বীভৎস কাহিনী পড়ে কিংবা কদাচিৎ সিনেমা দেখে এই সম্পর্কটার মোটামুটি খবর সে রাখে বটে কিন্তু নিজের এই মন-*খারাপ হওয়ার সঙ্গে যে এ রকম কোন আকর্ষণের সম্বন্ধ আছে, সে-কথা সে একবারও ভাবতে পারে না। ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছে ওর—স্ত্রী একটা অভ্যাস, জীবনের অঙ্গ-স্বরূপ হয়ে গেছে ওর কাছে। অন্য মেয়ের সঙ্গে মেশবার সুযোগও হয়নি—মা এবং বোন কিংবা কন্যা ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে অন্য সম্পর্কের কথা ওর জানা নেই। মন স্বাভাবিক নিয়মে যে আকর্ষণ, যে বেদনা বোধ করে, ওর শিক্ষা বা সংস্কার তার অর্থ খুঁজে পায় না। বিস্মিত হয়—মনোবৈকল্যের জন্য কিছু ক্রুদ্ধও হয়।

সেই রাগটাই গিয়ে পড়ল দিন-তিনেক পরে একদিন বিপাশার ওপর। দুপুরবেলা আহারাদির পর ও একটু নিদ্রা দেবার আয়োজন করছে এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে এসে পড়ল বিপাশা। একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে ওর চৌকীটারই এক কোণে বসে পড়ে পা নাচাতে নাচাতে বললে, 'আজ আমাদের ইস্কুলের ছুটি জানেন? দুপুরবেলা

সবাই ঘুমোচ্ছে, একা একা আমার ভাল লাগল না—আপনার খবর নিতে এলুম। কেমন আছেন ?'

বহুক্ষণের গুমোটের পর এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস পেলে মনের যেরকম ভাব হয়, বিপাশাকে তিন দিন পরে দেখে অতীশেরও সেই রকম একটা আনন্দ হ'ল। কিন্তু সেটা আবার সঙ্গে সঙ্গেও আরও চটে গেল। এই রকম মায়ায় জড়ানো বড়লোকদেরই একটা চালাকী। সে একটুখানি চুপ ক'রে থেকে কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'ছাখো, আমি একটু নিরিবিলি থাকার জন্যই এখানে ঘরভাড়া ক'রে একা বাস করি, তোমার বাবার অনেক অত্যাচারেও এ ঘর ছাড়িনি। আমি লোকের সঙ্গে মেলামেশা মোটেই পছন্দ করি না। তুমি যখন-তখন এমন ক'রে বিরক্ত করতে এসো না।'

প্রস্ফুট শতদল যেন নিমেষে শুকিয়ে গেল—ও মুখের অবস্থা দেখে অন্তত তাই মনে হ'ল অতীশের। বিপাশা ও রূঢ়তায় এতই অবাক হয়ে গিয়েছিল, যে প্রথমটা কোন জবাবই দিতে পারলে না, তারপর একটু যেন করুণ-কণ্ঠেই বললে, 'আপনি রাগ করেন আমার ওপর ? অতটা বুঝতে পারিনি।...আমি চলে যাচ্ছি, আপনি কিছু মনে করবেন না—'

বিপাশা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু অতীশেরও আর ঘুমোনো হ'ল না। মানুষকে আঘাত করার যে এতটা কষ্ট—যে আঘাত করে সে-ও যে এতটা দুঃখ পায় তা অতীশের জানা ছিল না। এমন ত আর কখনও অনুভব করেনি!

সেদিন সারা সন্ধ্যা সে অন্যমনস্ক হয়েই রইল। কাজে ভুল করার জন্য দুবার ইন্‌স্‌পেক্টরের কাছ থেকে ধমক খেলে। রাত্রে বাড়ী

ফিরে আর হোটেলে খেতে যাবারও ইচ্ছা রইল না। সমস্ত পৃথিবীটা যেন বিবর্ণ ঠেকতে লাগল। বিপাশাকে অকারণে আঘাত করার জন্য সে অনুতাপ বোধ করছিল, শুধু এই কথাটা বললে অতীশের অবস্থাটা কিছুই বলা হয় না—কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও যেন বুকের কাছটায় একটা দৈহিক ব্যথা অনুভব করছিল। এ এক বিচিত্র অনুভূতি—এ রকম এর আগে সে ভাবতেও পারেনি কখনও।

ওর মনে পড়ে গেল ওদের এক ইন্‌স্‌পেক্টার কয়েকদিন আগেই রসিকতা করে বলেছিল, 'ওরে, বাইবেলে নাকি লেখা আছে পুরুষের বুকের পাঁজর ভেঙ্গে ভগবান মেয়েছেলে সৃষ্টি করেছেন। নিজের বুকের জিনিষ বলে ওদের ওপর পুরুষের বোধ হয় অত টান! আসলে ওরা অত কিছু নয়—বরং অপদার্থ।'

বোধ হয় বাইবেলের কথাই ঠিক, সেইজন্যই মেয়েছেলের জন্য দুনিয়ার লোক পাগল—ভাবে অতীশ। ওদের জন্য কিছু একটা স্বার্থ-ত্যাগ করতে না পারলে পুরুষ কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না। নিজের অস্থি থেকে তৈরী বলে অত প্রিয় সে পুরুষের!...

কিন্তু তবু, এসব কথা ভেবেও কোন সান্ত্বনা পায় না। প্রতি দিন-রাত্রি বিস্বাদ বিবর্ণ ঠেকে—প্রতি মুহূর্তে কথাটা কাঁটার মত বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করে। অকারণে একটা ফুলের মত নিষ্পাপ, মধুর মেয়েকে আঘাত করেছে সে, কোন প্রয়োজন ছিল না তার অত রূঢ় হবার।

দিন পাঁচ ছয় এমনি ক'রে কাটাবার পর হঠাৎ অতীশ মরিয়া হয়ে উঠে একখানা ছুটির দরখাস্ত ক'রে দিলে। দেশেই সে যাবে

একবার। হিন্দুস্থানী কন্‌ডাক্‌টর গঙ্গারামের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। সে এখন পনেরোটি টাকা ধার দেবে—মাসে দেড় টাকা হিসাবে শোধ দিতে হবে একবছর ধরে। অর্থাৎ পনেরো টাকায় তিন টাকা স্থদ। কিন্তু তাতেই রাজী হয়েছে অতীশ। স্ত্রী মঞ্জুলা চিঠি লিখছে আজ তিন মাস ধরে, শরীর তার অত্যন্ত খারাপ, একটি বার যেন অতীশ দেখা দিয়ে যায়। যদি মঞ্জুলা মরেই যায় ত আর দেখা হবে না। তাছাড়া একবার এই আব্‌হাওয়া থেকে বাইরে যাওয়া অতীশেরও প্রয়োজন। নতুন ক'রে ওকে আবার কাজ আরম্ভ করতে হবে, পুরাতন আবেষ্টনীর মধ্যে না গেলে সে আর নিজের পরিচিত সত্তাকে খুঁজে পাবে না।

ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল, টাকা হস্তগত—তবু কে জানে কেন অতীশ একটা দিন নষ্ট করে। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য, বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কোন অর্থ হয় না। তার চেয়ে এ ভালই হ'ল, জিনিষটা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে গেল। আর, ত দেখলে যে বড়লোকরা অন্তরঙ্গতা করতে এলেই যে গরীবরা কৃতার্থ হবে তার কোন মানে নেই—এমনি নানা রকম ক'রে অতীশ মনকে বোঝালেও ওর মনের কোণে একটা আশা ছিল যে যদি দৈবাৎ দেশে যাবার আগে বিপাশার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ত মাপ চেয়ে নেবে।

কিন্তু সে স্থযোগ মিলল না, শুধু শুধু একটা দিনই নষ্ট হ'ল। সেদিন স্কুলের গাড়ী পর্য্যন্ত এল না বিপাশাকে নিতে। নিজের ওপর আরও বিরক্ত হয়ে অতীশ বেরিয়ে গিয়ে দু' একটা খুচ্‌রো জিনিয কিনে নিয়ে এল, তারপর নিজের ভাঙ্গা টিনের স্যুটকেশটাতে মালপত্র গুছোতে বসল! আজই সন্ধ্যায় ঢাকা মেলে চলে যাবে সে—আর একদিনও

নষ্ট করবে না। মোটে বারো দিনের ছুটি—যেতে আসতেই ত চার দিন নষ্ট হবে, থাকবে ক'দিন ?

পেছনে ফিরে বাক্স গোছাচ্ছে হঠাৎ দোরের দিক থেকে একটা ছায়া পড়তে দেখে চমকে চেয়ে দেখলে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বিপাশা। সে মুখে অভিমান বা দুঃখের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই—আগের মতই উজ্জ্বল সে মুখ, তেমনি দীপ্তিময়ী তার দৃষ্টি।

ওর সঙ্গে চোখোচোখি হ'তে একটু যেন ভয়ে ভয়ে বিপাশা প্রশ্ন করলে 'ভেতর আসব ?'

'এসে এসো—'

অকারণে খুশী হয়ে ওঠে অতীশ। জোর ক'রে সেদিনের স্মৃতিটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে প্রশ্ন করলে, 'কেমন আছো ? আজ ইস্কুলের গাড়ী আসেনি ?'

'না। আজ ইস্কুলে যাইনি।' ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে বিপাশা বলে, 'আপনাকে কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে। বলুন রাখবেন ?'

'কি কথা ? সম্ভব হ'লে নিশ্চয় রাখব।

'ও সব বুঝি না—বলুন রাখবেন ? না হ'লে ভারী দুঃখিত হবো কিন্তু। বলুন না—রাখবেন কথা !'

সেই ছোট্ট সুন্দর মুখটির দিকে চেয়ে মনে হয় অতীশের যে, বিপাশার অনুরোধ রক্ষা না করাই বোধ হয় অসম্ভব। সে কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। বলো এখন—কী কথা ?'

বিপাশা খুশীতে যেন জ্বলে ওঠে। বলে, 'আজ আমার জন্মদিন। আমার জন্মদিনে বাবা প্রত্যেক বারই অনেক লোক খাওয়ান, আজও

খাবে। আপনার নিমন্ত্রণ আজ আমাদের ওখানে—মা বলে দিয়েছেন। যেতেই হবে কিন্তু—আপনি কথা দিয়েছেন।'

আর যাই হোক—অতীশ এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলনা। সে ট্র্যাম কনডাক্টার অতীশ, যাবে অরবিন্দ সরকারের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে। এ যে অসম্ভব! সে আকুল কণ্ঠে বলে উঠলো, 'সে কি? কিন্তু সে যে হয় না ভাই, লক্ষ্মীটি, এ অনুরোধ [illegible] না।'

নিমেষে ম্লান হয়ে গিয়ে বিপাশা বললে, 'কিন্তু আপনি যে কথা দিয়েছেন!'

'তা দিয়েছি কিন্তু এ কি সম্ভব? তোমার বাবা শুনলে কি মনে করবেন বলো দেখি? নিশ্চয় তোমার বাবা এখনও জানেন না।'

'তা না-ই জানলেন। মা জানেন। তিনিই বাবাকে বলবেন। সে সব কিছু ভাববেন না।...আপনাকে কিন্তু যেতে হবে। নইলে আমি ভারী দুঃখিত হবো, ভাববো আপনি এ[illegible] আমার ওপর চটে আছেন।'

ওর মুখের দিকে চেয়ে 'না' বলতে অতীশের কষ্ট হ'ল তবু সে দৃঢ়কণ্ঠেই বললে, 'তুমি জানোনা, ছেলেমানুষ—একদিন বড় হ'লে হয়ত বুঝবে যে বড়লোকদের সঙ্গে আমার মত লোকের মিশতে যাওয়া কত অপমানের। তোমার ওখানে আজ কত লোক আসবেন, তাঁরা আমার সঙ্গে একসঙ্গে বসতেই সঙ্কোচ বোধ করবেন। মিছি-মিছি আমাকে একটা লজ্জা, একটা অপমানের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে?'

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বিপাশা বললে, 'বেশ, আপনি সন্ধ্যার আগে আসুন, আপনাকে আমি মায়ের ঘরে বসিয়ে আলাদা খাইয়ে

দেব। একটু জলখাবার আর চা না হয় খেয়ে আসবেন। এতে আর না বলবেন না—দোহাই আপনার। নইলে আমার মনে ভারি কষ্ট হবে। আপনার যেতে লজ্জা হয় আমি নিজে এসে ডেকে নিয়ে যাবো। বলুন যাবেন?—'

অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে অতীশ বললে, 'আচ্ছা তাই হবে। আমিই যাবো, ঠিক সাতটা।'

বিপাশা চলে গেলে অতীশ অনেকক্ষণ পাথরের মত স্থির হয়ে বসে রইল। তার ঠিক জানা নেই, তবে বড়লোকদের এই সব ব্যাপারে উপহার দেওয়ার একটা রেওয়াজ আছে এটুকু সে জানে। কি দেবে —কী দেওয়া সম্ভব তা ভেবে না দেখলেও তার পুঁজি যে মোট ঐ পনেরো টাকা! তা থেকে যা-ই খরচ করুক না কেন—দেশে যাওয়ার আশা তাকে ছাড়তেই হবে।

চুপ ক'রে বসে ভাবতে ভাবতে ওর মানসচক্ষে ভেসে উঠল মঙ্গলার শীর্ণ শ্রীহীন মুখ। এতদিনের অনাহার ও দুঃখের ফলে নিশ্চয়ই আরও শীর্ণ হয়ে গেছে। বেচারা! একবার স্বামীর দেখা পেলেই সে খুশী। তা-ও তার পাবার উপায় নেই।···এরা বড়লোক, কত অর্থ শুধু আজকের উৎসবে ওদের ব্যয় হবে—কত উপহার আসবে। তার মধ্যে যা-ই দিক না কেন অতীশ, তার কোন মূল্য থাকবে না ওদের কাছে। অথচ সেই টাকাতে তার দেশে ঘুরে আসা হবে। সেখানে তার বাবা মা, তার স্ত্রী, তার ছেলে-মেয়ে অপেক্ষা করে আছে।

কথাটা মনে হ'তেই বিপাশাকে কথা দিয়ে ফেলার জন্য অনুশোচনায়

সীমা রইল না ওর। আচ্ছা, সে যদি কিছু না-ই দেয়? সে-ত একাই যাবে, আলাদা খেয়ে চলে আসবে। কেউ জানতেও পারবে না, তার কাছ থেকে কেউ আশাও করে না কিছু। হয় ত কিছু দিতে গেলে উপহাসের চোখেই দেখবে। শুধু-হাতেই যাবে নাকি সে?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওঁর বিপাশার মুখটা মনে পড়ে গেল। সেই উজ্জ্বল মুখ ওর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উপহার পেলে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। তা ছাড়া…তাছাড়া, বিপাশা কত ক'রে তার মত একটা সামান্য লোককে নিমন্ত্রণ করেছে, নিশ্চয় বাড়ীর লোকের অমতেই— তাদের কাছে বিপাশার মাথা হেঁট না হয়। তারা যেন দেখে যে সামান্য লোক হ'লেও বিপাশার নিমন্ত্রণের মর্য্যাদা সে বোঝে। তাদের কাছে বিপাশা যেন সগর্ব্বে দেখাতে পারে যে, অতীশ ছোট কাজ করলেও সে ভদ্রসন্তান, ভদ্রসমাজের আইন-কানুন তার জানা আছে।

কিন্তু তবু অতীশ বসেই থাকে। এ যেন সে অতীশ নয়, যে ইউনিয়নের সভায় বড়লোকদের, পুঁজিবাদীদের গালাগাল দেয়—যে অতীশ মনে প্রাণে এইসব বড়মানুষী আধিক্যতাকে ঘৃণা করে। এ যেন তার জন্মান্তর!

সে বার বার তার মনকে শ্যামাঙ্গী পল্লীবধূ মঙ্গলার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, সেইটা তার কর্ত্তব্য—সেইটেই তার পক্ষে স্বাভাবিক। তার শান্তি, তার জীবনের সার্থকতা ঢাকা জেলার সেই নিভৃত পল্লীগ্রামেই আছে—এ উপদ্রব দু'দিনের খেয়াল মাত্র। এর জন্য তার কর্ত্তব্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়—এ কথা-দেওয়ারও কোন মূল্য নেই, দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত তার। কিন্তু তবু—মঙ্গলা যেন বড় সুদূর, তার ছবি মনের মধ্যে বড় ম্লান। সুন্দর, উজ্জ্বল

দুটি চোখে মিনতি উপছে পড়ছিল বিপাশার—বিপাশার অনুরোধ উপেক্ষা করার কথা কল্পনা করা যায় না। একটি মেয়ে আপনাথেকে শুধু তার খবর নিতে এসেছিল, তার নিঃসঙ্গ প্রবাসী জীবন সহানুভূতির ছোঁয়াচে আলোকিত করতে চেয়েছিল, সে অকারণে অপমান করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাতেও যে আহত হয় না, অভিমান পুষে রাখেনা—আবার জন্মদিনে মিনতি ক'রে নিমন্ত্রণ করতে আসে, তাকে হতাশ করবে অতীশ কোন্ প্রাণে!

বিপাশাকে বোঝেনা অতীশ—তার প্রতি অতীশেরও এ কিসের আকর্ষণ বুঝতে পারে না, তবু যেন মনে মনে ভয় পায়। মনে হয় ঐ উজ্জ্বল দুটি চোখকে ম্লান ক'রে দেবার ক্ষমতা আজ আর তার নেই—

আরও বহুক্ষণ সে বসে থাকে, অভিভূতের মত—অচৈতন্যের মত। সহসা এক সময় যখন সম্বিৎ ফিরে আসে তখন ঘড়ি দেখে সাড়ে ছটা!

সে পাগলের মত দ্রুত হস্তে বাক্স গুছিয়ে নেয়। এখান থেকে তাকে পালাতে হবে—আর এখনই। বিপাশা তার কেউ নয়, বিপাশা শুধু মায়া—অতীশ তার খেয়ালের খেলনা মাত্র। মঙ্গলা তার আত্মার আত্মীয়, তার মলিন মুখ, উৎসুক দুটি চোখকে নিরাশ করার কোন অধিকার অতীশের নেই। বুকের অস্থিতে একটি স্ত্রীলোকই একটি পুরুষের জন্য তৈরী হয়—মঙ্গলা তার সেই স্ত্রী।

কোনমতে ঘরে তালা লাগিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ল অতীশ—এখনও সময় আছে বটে, তবে সে সময় শিয়ালদা স্টেশনে কাটানোই

ভাল। আর নিজের ওপর ভরসা নেই ওর। ওকে এ বাসা বদ্‌লাতেই হবে—এই কথা মনে মনে জপ করে অতীশ। দেশ থেকে ফিরে এসে একশ' সত্তেরো নম্বরের সঙ্গে ওদের বাসাতেই থাকবে। এক ঘরে ওরা পাঁচ জন থাকে, তা থাক্—দু'টাকার বেশী ওর থাকার খরচ লাগবে না।

এই প্রতিজ্ঞাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকে ও, মনে মনে জপ করতে থাকে—তবু ট্রেণ যখন হু-হু ক'রে ছুট্‌তে থাকে সত্যি-সত্যিই, তখন অরবিন্দ সরকারের প্রাসাদের দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষমানা একজোড়া ম্লান চোখের কথা মনে প'ড়ে ওর পাঁজরের মধ্যে তেমনি খচ্ খচ্ করতে থাকে।

উন্নতি

রসময় বাবু বিরক্ত হয়ে কলম ছেড়ে উঠে পড়লেন। এইবার নিয়ে সকাল থেকে তিন বার তাঁর গল্প লেখার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। গল্প আসছে না মাথায়—এ সমস্যা ত আছেই, তার ওপর সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল—ঘোলা ঘোলা যা হোক্ একটা-কিছু যদি বা মাথায় আছে, সেটাকেও লিপিবদ্ধ করতে পারছেন না। যে টেক্‌নিক্, যে লিপি-কৌশল, ভাষার যে বিশিষ্ট ভঙ্গী তাঁর দাস হয়ে আছে ভেবে-ছিলেন, এ দুর্দ্দিনে তারা সবাই যেন তাঁকে ত্যাগ করেছে।

অথচ, রসময় বাবুর পেশাই হ'ল এই—গল্প লেখা। আজ তিনি বাংলা-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় গল্প-লেখক, বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'অপ-রাজেয় কথাশিল্পী।' আজ তাঁর লেখা গল্পের বই বা উপন্যাস দুমাস

তিন মাস অন্তর নতুন ক'রে ছাপাতে হয়—এত চাহিদা তাঁর বই-এর। প্রকাশকদের দ্বারস্থ হ'তে হয় না তাঁকে, তারাই চেকবই পকেটে ক'রে তাঁর দোরে ঘুরে বেড়ায়। আজ প্রকাশকদের তিনিই সর্ত্ত বলেন, তাঁর সর্ত্তেই তাদের রাজী হ'তে হয়। টাকা তিনি নেন যেন অনুগ্রহ ক'রে, তাঁরা টাকা দিয়ে কৃতার্থ হয়। এক কথায়, সিদ্ধি বলতে যা বোঝায়, তা সম্পূর্ণরূপেই তাঁর করতলগত।

হ্যাঁ, সিদ্ধি তিনি পেয়েছেন বৈ কি! যে বিলাস, যে আরাম একদিন ছিল স্বপ্নেরও অতীত, আজ তাতে যেন অরুচি ধরে গেছে, এমনই অনায়াসলব্ধ সেগুলো! এই এত-বড় বাড়ী তিনি করেছেন নিজের পয়সায়, দাসদাসীর অভাব নেই। এছাড়া গাড়ী আছে দুটো, একটা স্ত্রী-পুত্রের জন্য, একটা একেবারে তাঁর নিজস্ব। আরও কত কি! দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের উপকরণ যা-কিছু এদেশে পাওয়া সম্ভব, সবই তাঁর ঘরে এসে আজ জড়ো হয়েছে। সুখ ও শান্তি, শিল্প সৃষ্টি করার পক্ষে যে দুটিকে অপরিহার্য্য বলে মনে হ'ত এতদিন, সে-দুটির কোনও অভাবই আর তাঁর নেই।

কিন্তু তবু সৃষ্টি তিনি করতে পারছেন কৈ? একদিন ছিল, যখন একঘরে তাঁর সব ক-টি ভাই বাস করতেন, বসে লেখবার জায়গা একটু কোথাও পাওয়া যেত না, কিন্তু তবু সেদিন গল্প বা উপন্যাস রচনা তাঁর বন্ধ থাকেনি। এক একদিন বাড়ীতে এত হট্টগোল হ'ত যে ছাদে গিয়ে রোদে বসেই তাঁকে লিখতে হ'ত—বৈশাখের দুপুরেও ছায়া খোঁজেননি তিনি, গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে বসে পাতার পর পাতা তিনি লিখে গেছেন, কোন মতে কাগজের প্যাডটা ও মাথাটা রোদ থেকে বাঁচাতে পেরেই খুশী থাকতেন। মনে আছে একদিন কোথাও স্থান

না পেয়ে কলঘরের ভিজে মেঝেতে বসে কোলের ওপর প্যাড রেখে লিখেছেন। তবু না লিখে তিনি সেদিন থাকতে পারেননি, সৃষ্টির বেদনা সেদিন তাঁকে অস্থির, উন্মাদ ক'রে তুলেছিল। গল্পের পর গল্প, ছত্রের পর ছত্র সেদিন প্রকাশের জন্য মাথা কুটেছে তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে, তাদের লিপিবদ্ধ না ক'রে থাক্‌তে পারেননি।

অথচ সেদিন কত অসুবিধাই না ছিল! শুধু কি জায়গা ছিল না তাই? অভিভাবকেরা সেদিন ওটাকে সময়ের অপব্যয় ব'লে তিরস্কার করেছেন, বন্ধুবান্ধব ও ভায়েরা করেছে ঠাট্টা। উৎসাহ কোথাও থেকে পাননি, অতিকষ্টে সংগ্রহ করা পয়সায় ডাকটিকিট কিনে গল্পের সঙ্গে পাঠিয়েছেন তবু সম্পাদকরা তা ফেরৎ দেননি—ছাপা ত খুবই দূরের কথা! গরীবের ঘরে মানুষ তিনি—অভাব অনাটনও ছিল খুব, ভাল খাবার ভাল কাপড়-জামা ছিল সেদিন দুরাশা। কোন মতে কারুর হাতে-পায়ে ধরে টাকা চল্লিশেক মাইনের চাকরী জোগাড় করতে পারাই সেদিন চরম সার্থকতা বলে মনে হ'ত। তবু সেদিন লেখা তাঁর বন্ধ ছিল না। দারিদ্র্যের কোন আঘাতই সেদিন তাঁর গল্পের উৎস বন্ধ করতে পারেনি, সৃষ্টি না ক'রেই বরং সেদিন তিনি থাকতে পারতেন না।

আর আজ? লেখার সরঞ্জামই কত তাঁর! বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভাল ঘর, সেইটিই তাঁর লেখবার জন্য ঠিক করা হয়েছে। তাঁর দোরে দেওয়া আছে কম্বলের প্যাড, বাড়ীর কোন কোলাহল যাতে সেখানে পৌছে তাঁর চিন্তাসূত্রকে ছিন্ন করতে না পারে। মেহগ্নি কাঠের আধুনিক টেবিল, আটটা ঝরণা কলম, দু-তিন রকমের দামী কালি, নানা সাইজের অগুণ্‌তি প্যাড সাজানো থাকে।

লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে চেয়ারখানা ইচ্ছামত হেলিয়ে আরাম-কেদারা ক'রে নেওয়া যায়, সে ব্যবস্থা আছে। তিনি এম্‌নি খান সবচেয়ে দামী সিগারেট কিন্তু লেখার সময় চাই বিড়ি। সুতরাং একটি রুপোর কৌটোয় বিড়ি রাখা আছে সেখানেই। তিনি যখন লিখতে বসেন ডিকেণ্টারে ক'রে মিশ্রীর সরবৎ রেখে আসা হয়—মধ্যে মধ্যে তাঁর খেতে ইচ্ছা করে। এ ছাড়া এক-একদিন বিছানায় বসে বসেও লিখতে সাধ হয়। সে জন্য আলাদা একটি কাঠের ডেস্‌ক সর্ব্বদা শোবার ঘরে থাকে, তার ভেতর আলাদা প্যাড, কলম, কালী আছে। অর্থাৎ লেখকের যত রকম স্বাচ্ছন্দ্য মানুষ কল্পনা করতে পারে, তা প্রায় সবই তিনি পেয়েছেন।

তবু—

তবু যেন তাঁর সেই কল্পনাশক্তি, সেই অফুরন্ত গল্পের উৎস, সৃষ্টি করার সেই অদম্য ইচ্ছা, সব কেমন ক'রে শুকিয়ে আসছে, মরে আসছে—কিছুতেই আর তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারছেন না তিনি! আজ একটি গল্পের জন্য কোন কোন কাগজ তাঁকে যে টাকা দিতে চায়, একদিন তাই ছিল তাঁদের তিন ভায়ের এক মাসের মিলিত উপার্জ্জন! এর দশ ভাগের এক ভাগ টাকার প্রতিশ্রুতি পেলে সেদিন তিনি এক রাত্রে তিনটি গল্প লিখে ফেলতে পারতেন।

কিন্তু কেন? রসময় বাবু উঠে অধীর ভাবে পায়চারী করেন। এ কি তাঁর বার্দ্ধক্য? কী এমন বয়স হয়েছে তাঁর? পঞ্চাশ এখনও পূর্ণ হয়নি—স্বাস্থ্যও তাঁর বয়সী যে কোন লোকের চেয়ে ভাল আছে। তবে কি বুদ্ধিই তাঁর আচ্ছন্ন হয়ে আসছে! তাই বা কেমন ক'রে

স্বীকার করেন? আগেকার পড়া বই এখন পড়তে বসলে মনে হয় অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার নতুন ক'রে চোখে পড়ছে, যা আগে, বার বার পড়া সত্ত্বেও ধরতে পারেননি। সাহিত্যিক রস-বোধের দৃষ্টি যেন আগের চেয়ে আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

তবে?

এই প্রশ্নটারই কোন জবাব পান না তিনি। শুধু নিষ্ফল প্রয়াসের লজ্জা বার-বার তাঁকে আঘাত করে, অক্ষমতার ধিক্কারে দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা হয়।...

অথচ—স্থির দৃষ্টি দূর শূন্যে নিবদ্ধ ক'রে রসময় বাবু সুদূর অতীতে ফিরে যান—তখন রচনার উপাদান কত সামান্য ছিল! তাঁরই মত অবস্থার বন্ধুবান্ধব, তাদের বাড়ী যাওয়া-আসাতে যেটুকু সামাজিক অভিজ্ঞতা হ'তে পারে, তার বেশী কিছু ছিল না তাঁর। ভ্রমণ বলতেও দু-একবার থার্ড ক্লাসে কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি ঘোরার সুযোগ মিলেছিল—ঐ পর্য্যন্ত। আর আজ, বাংলা দেশের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেই ইচ্ছা করলে তিনি মেলামেশা করতে পারেন, বাংলার বাইরেও সভাপতি করার দৌলতে বহু স্থানে ঘুরেছেন তিনি। ভারতবর্ষের যেখানেই বাঙ্গালী আছে, সেখানেই তিনি কখনও না কখনও গিয়েছেন। আজ সর্ব্বত্রই তাঁর অবারিত দ্বার।

তবু—সহসা রসময় বাবুর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, একটা আলো যেন তিনি দেখতে পেলেন কোথায়—তবু মনে হয় তখনই যেন জীবনের সঙ্গে যোগ তাঁর বেশী ছিল। জীবন বলতে যা বোঝায়, তা তাদেরই মধ্যে ছিল, যাদের সঙ্গে তখন তিনি মিশতেন! আজ যে সমাজে তাঁর যাতায়াত, সেখানে প্রাণের সাড়া নেই, আজ যারা

তাঁর সামনে আসে, প্রত্যেকেই যেন একটি বিশেষ মুখোষ পরে আসে—আর যাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু স্বার্থের। আত্মা আজ তাই নিরন্তর. পীড়িত বোধ করে, আনন্দের অবকাশ তার মেলে না কোথাও।

তখন যারা বন্ধু ছিল, তারা তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা করত না, তাই শুধু স্নেহের সম্বন্ধ ছিল তাদের সঙ্গে। তখন তিনি চার-আনার সিটে বসে বায়স্কোপ দেখতেন; মানুষের ভীড় ঠেলে হেঁটে, নয়ত সেকেণ্ড ক্লাস ট্র্যামে বিচিত্র মানুষের সঙ্গে যাতায়াত করতেন প্রত্যহ। বৈচিত্র্যের তাই সেদিন অভাব হয়নি, মানুষের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় সেদিন মিলেছে আনায়াসে।

ভালবাসা?

ভালবাসার গল্প লেখা যে সম্ভব তাই যেন তিনি ভুলে গেছেন। আজ যে মেয়েগুলি কাছে আসে তারা শ্রদ্ধা করে হয়ত তাঁকে, তোষামোদ করে কিন্তু ভালবাসে না কেউ। তরুণী মেয়ের মুখের হাসি দেখলে পুরুষের চিত্ত দোলায়িত হয়—একথা অনুভব করা আজ কঠিন! কিসের গল্প লিখবেন তিনি, কার গল্প? তখনকার দিনের দু-একটি ছোট-খাট ঘটনা, নির্দোষ রোমান্সের কয়েকটি তুচ্ছ-স্মৃতি, তার যা মূল্য, আজ লক্ষ টাকা খরচ করলেও দেওয়া সম্ভব হবে না বোধ হয়। মনে আছে, তখন বোধ হয় তাঁর তেইশ বছর বয়স—এক বন্ধুর ষোড়শী ভগ্নী তাঁর চিত্তে সামান্য একটু প্রণয়ের সুর জাগিয়েছিল। বিশেষ কিছুই না, রোজ বিকেলে যেতেন শুধু শোভাকে দেখবার জন্য, দূরে দূরেই থাকত সে, কখনও হয়ত এসে চা বা জলখাবার দিয়ে যেতো, প্রয়োজন হ'লে দু-একটি প্রশ্নের উত্তর দিত। তিনিও

প্রথমে বুঝতে পারেনি যে শোভাকে তাঁর ভাল লাগে বলেই তিনি যান। অকস্মাৎ এক দিন লক্ষ্য করলেন যে, তিনি গেলেই শোভার মাথা নত হয়ে যায়, কর্ণে কপোলে অকারণে যেন কে আবির ছড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বুঝতে পারলেন তাঁর দুর্ব্বলতা কোথায়। সেদিনের সেই আবিষ্কারের পর তাঁর আনন্দ-বেদনার যে তীব্র অনুভূতি, আজও সে কথা মনে হ'লে তিনি যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠেন—মনে হয় প্রথম যৌবনের সেই প্রণয়-বিহ্বল দিনটিকে তিনি আজ তাঁর সমস্ত যশ, সমস্ত প্রতিষ্ঠার বদলেও ফিরে পেতে রাজী আছেন। ঘটনা হয়ত কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর—কিন্তু তবু সেদিন তিনি যা পেয়েছেন, পরবর্ত্তী জীবনে বহু মেয়ের বহু আত্মনিবেদনেও তার এক কণাও পাননি।

মনে আছে শোভা এক দিন তাঁকে হাতে হাতে লবঙ্গ দিতে এসেছিল, কেউ কোথাও নেই দেখে তিনি তার কম্পিত হাতখানি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছিলেন। তাঁর কাছাকাছি আসতে হ'লেই ইদানীং শোভার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপত থর থর করে, মুখখানা হয়ে উঠত লাল—কিন্তু সেদিন, সে যে কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তা কোন সাহিত্যেই কোন দিন প্রকাশ করা যায় না। তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন, হাতটা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে শোভার সমস্ত দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল এবং বোধ হয় চার-পাঁচ মুহূর্ত্তের মধ্যে তার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভেসে গেল।

শুধু ঐটুকু! কোন কলুষ কোন দিন তাঁদের সম্পর্ককে স্পর্শ করেনি, মুখ ফুটে কেউ কাউকে নিজের কথা বলেনওনি, তবু অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সমস্ত অকথিত বাণীই সেদিন এসে পৌঁচেছিল, পরস্পরকে তাঁরা যা বলতে চেয়েছিলেন তা শোনানো হয়ে গিয়েছিল।

উঃ—শোভার যেদিন বিয়ে হয়ে গেল—সে দিনের কথা রসময় বাবু কখনও ভুলতে পারবেন না! বেদনাবোধের সে তীব্রতা আজ কিছুতেই কোন মতেই অনুভব করা যায় না বটে কিন্তু সে দিন যে সমস্ত বিশ্ব, সমস্ত সৃষ্টি, নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎ একটা অন্ধকার শূন্যতায় ভরে গিয়েছিল তা মনে পড়ে। চার-পাঁচ দিন তিনি ঘুমোতে পারেননি, সারারাত কেঁদেছেন ছেলেমানুষের মতই—কাপড়ের পর কাপড় ভিজে গেছে চোখের জল মুছতে মুছতে। সেদিন সত্যসত্যই সারা জীবন অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল।

আজ এত দিন পরে সেই সব কথা মনে পড়ে রসময় বাবুর সমস্ত মন যেন কি একটা বেদনায় টন্ টন্ ক'রে উঠল। এ সে বেদনা নয় যাতে কেঁদেছিলেন সেদিন—এ সেই অনুভূতির, সেই রিক্ততার, সেই শূন্যতাবোধের অভাবের বেদনা! শোভার জন্য যে সেদিন কেঁদেছিলেন, কাঁদতে পেরেছিলেন এই স্মৃতিটাই যেন আজ তাঁর স্নায়ুর মধ্যে টন্ টন্ ক'রে ওঠে। আজ আর এমন কেউ নেই যার জন্য তিনি এমন ক'রে কাঁদতে পারেন, এমন কেউ নেই যার নামটা অপরের মুখে বার বার শুনতে ইচ্ছা করে, যার নামটা লোকের কাছে বার বার বলতে ইচ্ছে করে। কেউ নেই, কেউ নেই—যে জীবনে এমন অভিজ্ঞতা হ'তে পারত সে জীবনের সঙ্গে আর কোন যোগ নেই তাঁর, তাকে বহুদিন পিছনে ফেলে এসেছেন। আজ হয়ত আর সে বয়স নেই, কিন্তু সময় থাকতে থাকতেই সেই সহজ জীবনকে ত্যাগ ক'রে এসেছেন তিনি, পতঙ্গের মত খ্যাতি ও সার্থকতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন।

শুধু কি শোভা, আরও কত স্মৃতি ছিল তাঁর—কত অভিজ্ঞতা, কত

কিশোরীর কত সলজ্জ চাহনি, কত আকুল কণ্ঠের উদ্বেগ, কত মিনতি! সেদিন তিনি বিখ্যাত হন্‌নি, বিত্তশালী হন্‌নি সুতরাং সেদিনের সে আহ্বান, সে অনুরাগ ছিল আন্তরিক। তাই সেদিনকার দেহহীন অব্যক্ত প্রণয়ের স্পর্শ ই তাঁর কত ভালবাসার গল্পের খোরাক জুগিয়েছে—সত্য কথা বলতে কি, আজও তিনি সেদিনকার সেই সব রচনার খ্যাতি ভাঙ্গিয়েই চালাচ্ছেন, আজ আর মানুষের অন্তর স্পর্শ করবার মত সে ক্ষমতার কিছুই নেই অবশিষ্ট।

দরিদ্র ছিলেন তিনি, বাইরের বহু বাসনাকে সংযত করে রাখতে হয়েছে কিন্তু অন্তর তাঁর সেদিন পূর্ণ ছিল—প্রীতি ও স্নেহ সেদিন তিনি পেয়েছেন হৃদয় পূর্ণ করে। তাঁর তখনকার দিনের বন্ধুরা, সামান্য একটু অসুখ করলে দিন-রাত তাঁকে ঘিরে থাকৃত, প্রতিটি সুখ-দুঃখের অংশ না দিলে তাদের চল্‌ত না। কত সামান্য কারণে তাঁদের মান-অভিমান হয়েছে, আজ সে সব কাহিনী হাস্যকর, উপহাসাস্পদ বলেই মনে হয় কিন্তু সেদিন সেগুলোই ছিল সত্য, বন্ধুদের প্রতি অভিমানে চোখে যে জল এসেছে সেদিন, রাত্রের তন্দ্রা গিয়েছে ঘুচে—তার একটি বিন্দুও ব্যর্থ হয়নি, কোন মুহূর্ত্ত হয়নি মিথ্যা! এর চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান কারণেও আজ তাঁর অনুভূতি বেদনার সেই বিশেষ তারটিকে ছুঁতে পারে না—যা সেদিন অনায়াসে বেজে উঠত।

রসময় বাবু যেন কী একটা অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করে উঠলেন। এর কি কোন প্রতিকার নেই, আজ কি আর কোন রকমেই সেই দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনা যায় না? সেদিনের সেই মনকে, সেই সৃজনী-শক্তিকে?

আজ তিনি ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন যে সৃষ্টি করে শিল্পীর

মন—দেহ নয়। তাই তিনি যখন পাগলের মত দেহকে খুশী করার জন্য উপাদানের পর উপাদান জুগিয়েছেন, মন তখন সমস্ত সময়টা থেকেছে উপবাসী, আজ তাই আর সে সাড়া দেয় না, যে আনন্দরস তাকে প্রাণধারায় সিঞ্চিত করতে পারত তার অভাবে সে হয়ে পড়েছে মুমূর্ষু! ...আর এই সত্যটা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সেই বুভুক্ষু অন্তর যেন বহু যুগের তৃষ্ণা নিয়ে হাহাকার ক'রে উঠল। তিনি আজ একা, একা—আজ তাঁর সাথী কেউ নেই, বন্ধু কেউ নেই। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব তিনি। জীবনের যে স্বচ্ছ অনাবিল ধারা সংসারের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে তা থেকে আজ তিনি বহু দূরে, এক অঞ্জলি বয়ে এনে দেয় এমন কেউ নেই!

রসময় বাবু পাগলের মত লেখার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সামনেই শোবার ঘরের আলনাতে জামা টাঙানো ছিল, কোন মতে সেটা গায়ে গলিয়ে একেবারে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। ছেলেমেয়েরা অসময়ে তাঁকে পড়ার ঘর থেকে বেরোতে দেখে সবাই ছুটে এলো কিন্তু বোধ হয় তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির দিকে চেয়েই কিছু বলতে সাহস করল না। এমন কি, বিস্মিত দাসদাসীদের মারফৎ তাঁর স্ত্রীর কাছেও সংবাদটা পৌঁছেছিল, কিন্তু তিনি যখন ছুটে এলেন তখন রসময় বাবু গলির মোড়ও ছাড়িয়ে চলে গেছেন—তাঁকে দেখা গেল না। ইদানীং বাড়ীসুদ্ধ লোকই তাঁর খুঁটি-নাটি স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং আদেশ পালনের জন্য তটস্থ হয়ে থাকত—এমন কি জামা-জুতো পর্য্যন্ত কেউ এনে দাঁড়িয়ে না থাকলে তাঁর পরা হ'ত না। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে নিজেই এমন ক'রে বেরিয়ে পড়লেন—অবাক্ হবার কথা বৈ কি!

একেবারে বড় রাস্তায় যখন এসে পড়েছেন তখনও কিন্তু রসময় বাবু জানেন না কোথায় যাবেন। শুধু তাঁর মনে এই কথাটাই সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল যে যেমন করে হোক্ এই সব উপকরণের ব্যর্থতার মধ্যে থেকে ছুটি চাই। তাঁর। ঐশ্বর্যের এই জাল ছিঁড়ে বেরোনো চাই। সমস্ত বর্ত্তমান জীবন যেন তাঁর গলা টিপে ধরেছিল, আত্মা নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পর্য্যন্ত পাচ্ছিল না।

এইবার বাইরে এসে সেই প্রশ্নটাই বড় হ'ল—কোথায় যাবেন?

আচ্ছা, কোন মতে কি পারেন না, আগের জীবনের সেই খেই ধরতে? কোন মতে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা যায় না? বন্ধুদের কাছে যাবেন? বন্ধু-বান্ধব বলতে এখন যারা আছে প্রত্যেকের সঙ্গেই স্বার্থের সম্পর্ক, কোন না কোন দিকে। তাদের সঙ্গে কিছুতেই সহজভাবে মেশা যায় না। এক যাদের সঙ্গে হয়ত এখনও মানুষ হিসাবে, শুধু বন্ধু হিসাবে মেশা যায়, তাঁর সেই বাল্যকালের বন্ধুরা—তাদের ত কোন খবরই তিনি রাখেন না বহু দিন। কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, কে কী করছে কিছুই জানেন না। ...অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে মনে পড়ল তাঁর এক সহপাঠী দুর্গাপদ থাকত নবীন কুণ্ডু লেনে, সেটা তাদের পৈতৃক বাড়ী, হয়ত সেখানেই সে আছে এখনও। নম্বরটা ঠিক মনে নেই বটে, তবু হয়ত চেষ্টা করলে বাড়ীটা খুঁজে বার করতে পারবেন। দুর্গাপদ তাঁর ইস্কুলের সহপাঠী, অনেক সকাল-সন্ধ্যা তার সঙ্গে একত্র কেটেছে, তাঁদের ছেলেবেলাকার সেই দলটির সে-ও একজন। হয়ত, রসময় বাবুর মনের মধ্যে একটা আশা গুঞ্জরণ ক'রে উঠল, হয়ত তার কাছে গিয়ে আজকের সন্ধ্যাটা আড্ডা দিলে পুরোনো সেই সুরের সবটা না হোক্—কিছুটা বাজতে পারে।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দক্ষিণ দিকে ফিরলেন। বাড়ী থেকে যখন বেরিয়ে ছিলেন তখন যেখানেই যান না-কেন খানিকটা হাঁটবেন এই স্থির ছিল; কিন্তু এখন স্থানটা স্থির হওয়া সত্ত্বেও ঠিক হাঁটতে ইচ্ছা হ'ল না। ভীড় ঠেলে ঠেলে যাওয়ার অভ্যাস বহু কাল নেই, তাছাড়া হাঁটতে গেলে কেমন যেন হাঁপ ধরে আজকাল। কয়েক পা গিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন, এ যেন বড় কষ্ট, এককালে যখন তিনি আট মাইল দশ মাইল পর্য্যন্ত হেঁটেছেন তখনকার সে অভ্যাসের আজ আর কিছুই নেই।

কিন্তু ফিরে গিয়ে গাড়ীতে চড়াও সম্ভব নয়। ঐশ্বর্য্যের কোন ছোঁয়াচ নিয়ে তিনি বন্ধুর কাছে যাবেন না, তা ছাড়া আজ তিনি বহু দিন পরে জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য বেরিয়েছেন, মানুষ থেকে দূরে থাকা চলবে না। ট্র্যামেই যাবেন তিনি। মন্দ কি. বহু দিন ট্র্যামে চড়েননি—একটা বৈচিত্র্যও ত হবে।···

রাস্তাটা পেরিয়ে রসময় বাবু ট্র্যামের স্টপে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু একখানার পর একখানা ট্র্যাম বেরিয়ে গেল, তাঁর আর চড়া হ'ল না। বহু কাল ট্র্যামে চাপেননি, এখন যে অত ভীড় হয় তা তাঁর জানা ছিল না, মোটরে করে চলে যাবার সময় হয়ত চেয়েছেন অন্যমনস্ক ভাবে কিন্তু অত লক্ষ্য করেননি। তাছাড়া, তাঁর মনে হ'ল, হয়ত আগেও এমনি ভীড় হ'ত কিন্তু তখন সেই ভীড় ঠেলাটাই অভ্যাস ছিল বলে অতটা বুঝতে পারতেন না—আজ মনে হচ্ছে এত লোক ঠেলে কেমন করে ওঠা সম্ভব!···চার-পাঁচখানা ট্র্যাম পর পর চলে গেল, তাঁর ওঠা হ'ল না—এই দুর্ব্বলতার জন্য রসময় বাবু লজ্জিত হলেন কিন্তু তবু কিছুতেই সাহস ক'রে উঠতে পারলেন না, ওঠবার চেষ্টাও করলেন না।

শেষ পর্য্যন্ত এক সময় নিজের কাছেই স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, যে এ আর তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়।

ফিরে এসে পেভ্‌মেণ্টে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল একখানা খালি ট্যাক্সি। হাত তুলে ডাকতে গিয়েও আবার হাত নামিয়ে নিলেন। মনে পড়ল যে ঐশ্বর্য্যের কোন চিহ্ন নিয়ে যাবেন না বন্ধুর কাছে, এই প্রতিজ্ঞা; আরও একটু ইতস্ততঃ করে রিক্সাই একটা ডাকলেন, এর চেয়ে বেশী আর নামা সম্ভব নয়, হাঁটা বা ট্র্যাম চড়া তাঁর দ্বারা আর কোন দিনই হয়ে উঠবে না।

নবীন কুণ্ডু লেনে বাড়ীটা অনেক কষ্টে যখন খুঁজে বার করলেন তখন সন্ধ্যার বেশী দেরী নেই, দুর্গাপদ সবে আফিস থেকে ফিরে কাপড় ছেড়ে একটি বড় গোছের শুক্‌নো গামছা পরে ছেলেমেয়েদের একদফা বকাবকি করছেন। রসময় বাবুর ডাকে বাইরে গিয়ে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন, কিছুতেই যেন মানুষটাকে তাঁর এই আব্-হাওয়ার মধ্যে চিনতে পারছিলেন না। রসময় বাবু একটু হেসে বললেন, 'এরি মধ্যে ভুলে গেলি? ক-টা ছেলেমেয়ে হয়েছে রে?'

'ও, রসময় তুই?...মানে আমাদের রসময়—এস এস ভাই এসো—তুমি যে এতদিন পরে আমাকে খুঁজে বার করবে এ ধারণাই করতে পারছিলুম না।'

রসময় বাবু ওঁর পিছনে পিছনে বাইরের ঘরে এসে বসে বললেন, 'কিন্তু তুই থেকে তুমি কেন হ'লো বল দেখি আগে—'

অপ্রস্তুত হয়ে দুর্গাদাস বললেন, 'না, তা নয়। তুই-টা আগের অভ্যাস মত বেরিয়ে গিয়েছিল—'

রসময় বাবু বললেন, 'তা জানি। অভ্যাসটা বদ্‌লালো কবে, তাইতো জিগ্যেস করছি।'

আরও অপ্রতিভ ভাবে দুর্গাপদ বললেন, 'না বদ্‌লায়নি। তবে হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে কার সঙ্গে কথা কইছি, অমনি নার্ভাস হয়ে পড়লুম। আজ ভাই আপনির চেয়েও বড় কোন সম্বোধন থাক্‌লে তাই বলেই তোমাকে ডাকা উচিত। আজ তুমিই আমাদের দেশের গৌরব, সে কথা ভুল্‌লে তো চলবে না!'

ক্লান্ত কণ্ঠে রসময় উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে—ছেলে-মেয়েরা কোথায়? ডাক্ না তাদের।'

'এই যে ডাকছি। ওরা ত, হুঁ—এমন দিন নেই যে বড় ছেলেটা তোমার নাম করে না, তোমার বইয়ের অদ্ধেক লাইন মুখস্থ। তুমি এসেছ শুন্‌লে আনন্দে ওরা বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে।...ওরে কোথায় গেলি রে তোরা—এই খুকী তোর দাদা কোথায় রে? খেলতে গেছে? যা যা খবর দে—মান্টু, খুকী সব কোথায়? এদিকে আয়, এদিকে আয়। ওগো শুনছ, রসময় এসেছে, তোমাদের অথর রসময় মুখুজ্জে—ব্যাপার কি তোমাদের?'

ডাক্‌তে ডাক্‌তে কারুর দেখা না পেয়ে দুর্গাপদ বাড়ীর ভেতরে ঢুকেছিলেন, শেষের প্রশ্নটা সেইখানেই করা—রসময় বাবু ঘরের ভেতর থেকে শুন্‌তে পেলেন। কিন্তু তার পরই কোন একটা অজ্ঞাত কারণে দুর্গাপদর গলা একেবারে থেমে গেল, অর্থাৎ তিনি প্রশ্নের জবাব পেলেন ইঙ্গিতে। আরও মিনিট-দুই পরে যখন সারিবদ্ধ ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন তখন রসময় বাবুও ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। ছেলেমেয়েরা এম্‌নি খেল্‌ছিল, তাড়াতাড়ি তাদের

ধরে ফরসা জামা পরানো হয়েছে, মেয়েদের মুখে পাউডারও পড়েছে। এক কথায় যতটা সম্ভব ভদ্র করা হয়েছে।

একটু পরে দুর্গাপদর স্ত্রীও এলেন, তাড়াতাড়ি আধময়লা কাপড়টা বদ্‌লে একখানা ধোওয়া শান্তিপুরে সাড়ী পরে। অতিথি যিনি এসেছেন তিনি যে মাননীয়, বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, সে কথা তাঁদের কারুর জানতে বাকী নেই। বড় ছেলে পুঁটে থার্ড ইয়ারে পড়ে, সে একটা ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে পাড়ারই কোন অপেক্ষাকৃত চওড়া গলিতে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল—তার ছোট ভাই গিয়ে সংবাদটা দিতে ঠিক বিশ্বাস হয়নি, তবু এসেছিল সে ছুটতে ছুটতেই। গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় একবার দরজার কাছ থেকে উঁকি মেরে দেখে সে-ও ভেতরে চলে গেল—ফিরে এল প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে, ইতিমধ্যে সে-ও মুখ-হাত ধুয়ে, মাথা আঁচড়ে ফরসা জামা পরে তৈরী হয়ে এসেছে। যাঁর লেখা পড়ে সে কত রাত্রে ঘুমোতে পারেনি, সেই সর্ব্বজনবন্দনীয় সাহিত্যিক এসেছেন তাঁদের বাড়ীতে—তিনি না অভদ্র ভাবেন, সেটা ত দেখা দরকার!

তবু রসময় বাবু বসে রইলেন অনেকক্ষণ, কিন্তু সে সুর আর বাজ্‌ল না। পুঁটে তার অটোগ্রাফের খাতা ত সই করালেই, খবর পেয়ে আরও চার পাঁচটি ছেলে এসে সই করিয়ে নিয়ে গেল। পাড়ার লাইব্রেরীতে একদিন আসবেন—এ প্রতিশ্রুতিও দিতে হ'ল। অর্থাৎ খ্যাতির আব্‌হাওয়া থেকে কিছুতেই মুক্তি নাই তাঁর! এমন কি দুর্গাপদ পর্য্যন্ত সহজ হ'তে পারলে না কিছুতেই। রসময় বাবু নিজে বার বার রসিকতা ক'রে, ছেলেবেলার গল্প তুলে সেই আগেকার

আব্‌হাওয়াতে ফিরে যাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর হৃদয়াবেগের কোন উষ্ণতাতেই দুর্গাপদর মনে সম্ভ্রম-বোধের হিম-আবরণ গলানো গেল না। হয়ত দুই তিন মুহূর্ত্তের জন্য তিনি ভুলে যান অতিথির পদ-মর্য্যাদার কথা, সেই সময়টা কিছু সহজ ভাবে কথা বলেন—আবার পরক্ষণেই কথাটা মনে পড়ে গিয়ে যেন দূরে চলে যান—সেই দূরে, যেখানে রসময় বাবুর সমস্ত ভক্তরা এক হয়ে মিশে প্রাণপণে একটা ব্যবধান রচনা করে রেখেছে, তাদের আর তাঁর মধ্যে!

তা ছাড়া, দুর্গাপদর কৌতূহল রসময়ের সম্বন্ধে বহুদিন ধরে জমে ছিল, সুতরাং প্রশ্নগুলো তাঁর খ্যাতি-পথ-রেখা ধরেই চলেছে বার-বার! কি রকম আয় হয় তাঁর, সাধারণতঃ বই থেকে কত পান, কী বন্দোবস্তে প্রকাশকরা নেয়, ইত্যাদি—এ ছাড়া কতগুলো মোটর কিনেছেন, বাড়ীতে কত খরচ পড়ল, আর জমি কেনার ইচ্ছা আছে কিনা—এসব প্রশ্ন ত আছেই। অর্থাৎ বারে বারেই দুর্গাপদ তাঁর বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছিলেন।

রসময় বাবু সব চেয়ে হতাশ হলেন জলখাবার আসতে। এর আগে, ছেলেবেলায় যতদিন তিনি এ বাড়ীতে এসেছেন দুর্গাপদর মা গরম পরোটা ও নারকেল নাড়ু জল খেতে দিয়েছেন তাঁকে। সেই স্মৃতিটা মনে ছিল—হয়ত আশাও ছিল কোথাও একটা, কিন্তু খাবার এল কচুরী-সিঙ্গাড়া-সন্দেশ-রসগোল্লা। রসময় বাবু মুখ একটু বিকৃত ক'রে বললেন, 'এর কোনটাই ত আমার চলবে না ভাই—ভীষণ অম্বল হবে।...একটা মিষ্টি শুধু খাবো আমি—'

তার পর, যেন কতকটা লোভীর মতই বলে উঠলেন, 'আগে, মানে যত দিন তোর মা বেঁচেছিলেন নারকেল নাড়ু প্রতিদিন ঘরে তৈরী

থাকত, না? বেশ মনে আছে আমার, পরোটা আর নারকেল নাড়ু বড় ভাল লাগত।'

দুর্গাপদ হেসে বললেন, 'নারকেল নাড়ু এখনও তৈরী থাকে বারো-মাসই। আমি সে কথা গিন্নিকে বলেছিলাম যে, আম কেটে আর নারকোল লাড়ু দিয়ে দাও, খান কতক লুচি না হয় তার সঙ্গে ভেজে দাও, তা তিনি আমাকে মারতে বাকী রাখলেন, বললেন হ্যাঁ, ঐ সব খাবার নাকি ওঁর সামনে বার করা যায়!'

রাত আটটা নাগাদ রসময় বাবু উঠে পড়লেন। ক্লান্ত তিনি, বিরক্তও বটে। বিরক্ত নিজের ওপরই যেন বেশী। কিন্তু তবু বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা হ'ল না। ধীর মন্থর গতিতে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত হাঁটতে পারবেন না ঠিকই, তবু যতটা পারেন।

গলি ছাড়িয়ে কলেজষ্ট্রীটে পড়তেই একটা ক্ক জ্বলে সিনেমার পোস্টার চোখে পড়ল! হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। সিনেমা? মন্দ কি! বহু দিন যান নি, তা ছাড়া অন্ধকারে চুপি চুপি সামনের ফোর্থ ক্লাসে গিয়ে যদি বসেন?

রসময় বাবুর চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠল। আজ কাল ন'টাতেই রাত্রের শো আরম্ভ হয়, এগারোটা নাগাদ ভাঙ্গে। বাড়ী ফিরতে খুব রাত হবে না। এই সুবিধা, এত রাত্রে চেনা লোক থাকবে না, প্রতি-নিয়ত অসংখ্য চক্ষুর সম্ভ্রম ও বিস্ময়-ভরা চাহনি তাঁকে অনুসরণ করবে না—একটু স্বস্তিতে বসে দেখতে পারবেন। এই ভাল।

তৎক্ষণাৎ একটা রিক্সা ডেকে চেপে বসলেন। আগেই যে সিনেমার

কথা মনে এল সেই খানে যেতে বলে দিলেন। ছবিটা তাঁর গৌণ, যেখানে হোক্ গেলেই হ'ল। ফোর্থ ক্লাসে বসে দামী সিগারেট খাওয়া অশোভন হবে মনে করে বিড়ি কিনে নিতেও তাঁর ভুল হ'ল না। এতক্ষণ পরে একটা ভাল বুদ্ধি মাথায় এসেছে মনে ক'রে যেতে যেতে তিনি নিজেকেই বার বার তারিফ করতে লাগলেন।

সিনেমাতে গিয়ে দেখলেন ফোর্থ ক্লাস, থার্ড ক্লাস সব টিকিটই বিক্রী হয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে গুণ্ডারা ছিল, ছ' আনার টিকিট চৌদ্দ আনায় কিনে তিনি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে লাগলেন, একেবারে আরম্ভ হওয়ার সময়ে ভেতরে যাওয়া যাবে।

কিন্তু সিনেমার মধ্যে অনেক দিন পরে ঢুকে যেন চম্‌কে উঠলেন। অনেক দিন এদিকে আসেননি, এলেও ইদানীং দোতলায় দামী আসনে বসেন, অধিকাংশ সময়েই নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। বিড়ি সিগারেটের ধোঁওয়ায় ভেতরে যেন একটা শক্ত পর্দা পড়ে গেছে, গরমের দিনে নিম্ন-মধ্যবিত্তদের জামা-কাপড়ে যে ভ্যাপ্‌সা গন্ধ ছাড়ে তার সঙ্গে বিড়ির গন্ধ নাকে গিয়ে যেন বমি আসে। এইখানে বসে দু'ঘণ্টা বায়স্কোপ দেখতে হবে? ছেলেবেলাতে বিস্তর সিনেমা দেখেছেন তিনি, এক এক দিন দুটো তিনটে করে শো-তেও গেছেন, কৈ—তখন ত এসব বুঝতে পারেনি, এরই মধ্যে এত বদ্‌লে গেছেন তিনি?...এক বার মনে হ'ল বেরিয়ে চলে যান, কিন্তু পরক্ষণেই মনকে শাসন করলেন, এ সব দুর্ব্বলতাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না, আজ তিনি বসে দেখবেনই—যা হয় হোক্।

ছবি আরম্ভ হ'ল। এম্‌নি কৌতূহল না থাকলেও দেখতে দেখতে ছবিতেই সারা মন বসে গিয়েছে, বেশ তন্ময় হয়েই দেখছেন। হঠাৎ

এক সময়ে মনে হ'ল পিছনে যে ছেলেগুলি বসেছে তারা বড় বেশী রকমের কথা কইছে। একবার অন্যমনস্ক ভাবেই ফিরে তাকালেন, তখনকার মত সুফলও পাওয়া গেল, কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল—কিন্তু একটু পরেই আবার ফিস্ ফাস্! বিরক্ত হয়ে একটা ধমক দেবেন কি না ভাবছেন, এমন সময় মনে হ'ল তাদের কে তাঁরই নাম উচ্চারণ করলে। তবে কি—?

রসময় বাবু এবার রীতিমত ভীত হয়ে উঠলেন। হ্যাঁ—সন্দেহের আর অবকাশ নেই, ছেলেগুলি এতক্ষণ তাঁকে নিয়েই ফিস্-ফাস্ করছে। তিনিই ঠিক রসময় বাবু কি না তাই নিয়ে বেধেছে তর্ক। যাদের দৃষ্টিশক্তির ওপর আস্থা আছে তারা বলছে ইনিই রসময় বাবু, আর একদল বলছে অসম্ভব! তাঁর আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—ছ'আনার সিটে বসে বায়স্কোপ দেখতে এসেছেন

তাদের এই ফিস্-ফাস্ যেন দেখতে দেখতে অন্য বেঞ্চিতে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হ'ল আশে-পাশের বেঞ্চিতে বাকী লোকরাও সম্ভ্রমে ও সন্দেহে ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। ক্রমশঃ রসময় বাবু অনুভব করলেন, তাঁর চার দিকে বহুলোকই পর্দ্দা থেকে চোখ নামিয়ে তাঁর দিকেই চেয়ে রয়েছে!

লজ্জায় ভয়ে রসময় বাবু ঘেমে উঠলেন। যদি ওরা সত্য-সত্যই চিনতে পারে? একটু পরেই ইণ্টারভাল হবে, সব ক'টা আলো উঠবে জ্বলে, তখন আর সংশয়ের অবকাশ মাত্র থাকবে না। তিনি রসময় মুখুজ্যে, কতকগুলা চ্যাংড়া ছেলের সঙ্গে ফোর্থ ক্লাসে বসে বায়স্কোপ দেখছেন আর বিড়ি খাচ্ছেন—এই চমকপ্রদ এবং মুখরোচক কাহিনী কি আর কোথাও ছড়িয়ে পড়তে বাকী থাকবে? কে জানে,

হয়ত এ সংবাদ কাগজে পর্য্যন্ত উঠবে—সাপ্তাহিক কাগজে এ নিয়ে কার্টুন ছাপাও বিচিত্র নয়।

ছিঃ ছিঃ! আত্মধিক্কারে রসময় বাবু সব কথা ভুলে গেলেন। এ দুর্ম্মতি কেন তাঁর হ'ল! সবাই তাঁকে কত সম্ভ্রমের চোখে দেখে—এই সব ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের কাছে তিনি ত দেবতা-বিশেষ। আর কিনা তাদের সঙ্গেই—

আর ভাবতেও পারলেন না তিনি। অতিকষ্টে হাত-ঘড়িটা দেখলেন, প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে, ইন্‌টারভালের আর দেরি নেই। একবার আলো জ্বললে তিনি আর মুখ দেখাতে পারবেন না। এতক্ষণে কথাটা নিয়ে যে কী পর্য্যন্ত আলোচনা চলছে তা বেশ বোঝা গেল এইতে যে, দূরের লোকগুলিও উঠে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে তাঁকে দেখতে শুরু করেছে।

তিনি প্রায় মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ালেন! কোন মতে লোকের হাঁটু ঠেলে ঠেলে এসে নিজেই দোর খুলে বাইরে চলে এলেন, তারপর পাছে আর কেউ তাঁর পিছু পিছু আসে এই ভয়ে এক রকম ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল সামনে দিয়ে, সেইটেই ডেকে নিলেন তিনি, তার গদি-আঁটা কোণে মাথা রেখে অনেকক্ষণ পরে যেন নিঃশ্বাস ফেললেন।

নাঃ—আর নিজেকে বঞ্চনা ক'রে লাভ নেই। কথাটা তিনি যেন নিজেকে জোর ক'রে শোনালেন মনে মনে—দুঃখের কথা হয়ত হতে পারে কিন্তু এইটেই সত্য। তিনি আজ এতই ওপরে উঠেছেন যে, কোন মতেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজ ভাবে আর তাঁর মেশা

সম্ভব নয়। যশ ও সার্থকতার দুটি পক্ষিরাজ ঘোড়া তাঁকে তাঁর পূর্ব্বেকার জীবনযাত্রা থেকে বহুদূরে উড়িয়ে এনে ফেলেছে, এখন আর এই দীর্ঘপথ ফিরে যাওয়া তাঁর দ্বারা হয়ে উঠবে না। যে সম্মানের মুকুট তিনি পরেছেন মাথায়, তা যত গুরুভারই হোক্ তাঁকে বহন করতেই হবে।

ট্যাক্সী হু-হু করে ছুটে চলেছে। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল তিনি জীবন থেকে, আনন্দ থেকে, যা কিছু স্বচ্ছন্দ ও সহজ, তা থেকে এমনি ক'রে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর নিজের তৈরি করা নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ স্বর্গে।

দানপত্র

এটর্নী সত্যশরণবাবু বারবার ঘড়ি দেখছেন, তাঁর কেরাণী ভুরু কুঁচ্‌কে একটা পেন্সিল মুখে দিয়ে বসে আছেন—অর্থাৎ নিঃশব্দে যতটা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা যায়, তা তাঁরা দুজনেই করছেন; কিন্তু সেদিকে কৃষ্ণলালবাবুর খেয়ালই নেই—তিনি চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে রয়েছেন, হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি-বা ঘুমোচ্ছেন।

অবশ্য এটা তাঁর ঘুম নয় এবং তা সত্যশরণবাবুও জানেন। কৃষ্ণলাল ভাবছেন—বাইরে তাঁর এই স্থির, শান্ত মূর্ত্তি দেখলে বোঝাই যাবে না তিনি কত দ্রুত ভাবছেন আর তাঁর মনের মধ্যে কি আলোড়ন চলেছে। কত স্মৃতি, কত বেদনা, কত চিন্তা এক সঙ্গে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর মাথায়!

ঘুম নেই তাঁর চোখে বহুদিন—এককালে সেটা ছিল উপসর্গ, ক্রমে

সেইটাই রোগ হয়ে দাঁড়াল। এখন তিনি মৃত্যুপথযাত্রী—অনিদ্রা, রক্তের চাপ, বহুমূত্র আরও কত কি—বাঁচবার যে আর আশা নেই তা সবাই জানে, এমন কি তিনি নিজেও জানেন বলেই তাঁর এটর্নীকে ডাকিয়েছেন—আজ তিনি উইল্ করবেন, চরম দানপত্র!

তাঁর নিজের বলে সংসারে কেউ নেই, স্বাভাবিকভাবে তাঁর এই বিপুল বিত্ত যাদের কাছে যেতে পারত, এমন কোন আত্মীয় নেই তাঁর। স্ত্রী, পুত্র কেউ নেই। সেই জন্যই উইল করে যাবার প্রয়োজন হয়েছে—একেবারে মৃত্যুর পথে পা দিয়েও শান্তি নেই, ভাবতে হচ্ছে তাঁর এত কষ্টে উপার্জ্জিত টাকাটা কাকে দিয়ে যাবেন।

কৃষ্ণলাল ধনকুবের—বোধ হয় বাঙ্গালীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ঐ উপাধিটা লজ্জিত না হয়ে বহন করতে পারেন। বিরাট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, অনেকগুলো কল-কারখানা, ভাড়াটে বাড়ি, শেয়ার মার্কেটের লেন-দেন—অর্থ উপার্জ্জনের বিচিত্র ও অসংখ্য পথ তাঁর। এছাড়া ব্যাঙ্কে যে তাঁর ঠিক কত টাকা আছে, তা তাঁর এটর্নি বন্ধু সত্যশরণবাবুও অনুমান করতে ভয় পান। অথচ ব্যবসা চালানো ত দূরের কথা—টাকাটা ভালভাবে ভোগ করবে, এমন লোকও তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

অবশ্য স্ত্রী-পুত্র নেই বলে যে অন্য আত্মীয়ের অভাব আছে, তা নেই। এত বড় বাড়ি তাঁর ভরা থাকে বারোমাস; এখন ত কথাই নেই! বোধ হয় তিলধারণের ঠাঁই হবে না কোথাও। তাঁর এক বৃদ্ধা বৌদি, তাঁর সবকটি ছেলেমেয়ে, ছেলেদের বৌ ও তাদের ছেলেমেয়ে—এইতেই বোধ হয় আঠারো-উনিশ জন হবে। ভাইপোরা তাঁরই বিভিন্ন অফিসে কাজ করে, অর্থাৎ কাজ করার নাম

ক'রে মাসোহারা পায়। তিনটি ভাইপোই ক্ষুদ্র নবাব এবং অপদার্থ। কাজ বোঝে না, বোঝার চেষ্টা করে না—কাকার পীড়াপীড়িতে অফিস যেতে হয়, সেজন্য বরং তারা বিরক্ত। এরা সবাই জানে যে এই বিপুল সম্পত্তি তাদেরই হবে একদিন, আর সে একদিনটাও খুব দূর নয়। সুতরাং তাদের মত ভাবী বড়লোকদের কাজ করতে বলার মত মূর্খতা আর কিছু হ'তে পারে না। তবে একটা কাজ তারা করে—কৃষ্ণলাল নিজে অর্থ উপার্জ্জন করলেও বড়মানুষি করতে পারেন নি একদিনও, সেই অভাবটা তারা পুরণ করেছে। এমন কি একথাটাও বলা যেতে পারে যে, সেদিক দিয়ে স্বয়ং কর্ত্তারও অনেক কিছু শেখবার আছে তাদের কাছে—

এদের প্রতি কৃষ্ণলালের স্নেহ কম নেই। তারা প্রত্যেকে একখানা ক'রে মোটর কিনেছে তাঁরই অর্থে—প্রত্যহ যে প্রচুর টাকা তারা খরচ করে তাও তিনিই জোগান—সুতরাং তাদের হাতে এ সম্পত্তি ছেড়ে দিতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, যদি এই ভরসাটা মনের মধ্যে থাকত যে, তাঁর ব্যবসাগুলো বাঁচিয়ে রেখে আয়ের পথটা তারা বজায় রাখতে পারবে! কিন্তু সে যোগ্যতা তাদের কারোর নেই—তাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত কটা দিন হয়ত ওরা অফিসে যাবে তারপর তা-ও যাবে না, এ তিনি জানেন।

এরা সবাই তাঁর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। প্রত্যেকেরই আশা আছে সে মোটা টাকা পাবে। ভাইপো-বৌ'রা, যদিচ তারা জানে যে তাদের স্বামীরাই সব-কিছু পাবে, তবু তারাও আশা করছে যে কর্ত্তা যাবার সময় তাদের নাম করে আলাদা কিছু মোটা টাকার ব্যবস্থা করে যাবেন। সেজন্য শ্রদ্ধাভক্তির প্রতিযোগিতা চলেছে

তাদের মধ্যে। এমনকি নাতি-নাত্‌নিরাও টাকার খবরটা জানে, তারা ছেলেমানুষ বলে এক, এক সময়ে বলেই ফেলে: আমাদের কাকে কত টাকা দিয়ে যাবে দাদু—তুমি নাকি অনেক, অনেক টাকা সবাইকে দিয়ে যাবে?

ওঁর একটি মামাতো ভাই আছে ছোট। সে কাজকর্ম্ম করার ভানও করে না, স্পষ্টই বলে, 'মাথার কাজ আমার দ্বারা হবে না দাদা, ব্লাড্‌প্রেসার বেড়ে যায় ওতে—এম্‌নি কি করতে হবে বলো, রাজি আছি।' বাজার হাট অর্থাৎ টাকা খরচের কাজটা সে কোনমতে করে। আশা আছে যে, ভাড়াটে বাড়ীগুলো কর্ত্তা তাকেই দিয়ে যাবেন।

খুড়তুতো ভাই দু-তিনটি তাঁর কাছে কাজ করে—তারা আলাদাই থাকৃত, অঁসুখের খবর পেয়ে সপরিবারে এ-বাড়িতে এসে আছে। এক খুড়তুতো ভাই-এর ছেলে ইতিমধ্যেই স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা থাকৃত—সে এ ক'দিন রোজ আসছে একবার ক'রে। তবে সে এখানে থাকার চেষ্টা করে না, কৃষ্ণলালবাবুকে শুনিয়ে সেদিন বলে গেছে যে, 'এতদিন কখনও এবাড়ীতে এসে থাকিনি, আজ যদি এসে থাকি তো কাকা মনে করবেন তাঁর বিষয়ের লোভে এসেছি।...না জ্যাঠাইমা, সে আমার দ্বারা হবে না। নইলে এ সময়ে ত কাছে থাকাই উচিত—লোক ত কত আছে, কিন্তু সেবা করবার মত কাউকে দেখি না—'

কথাটা মনে পড়ে এই সময়েও কৃষ্ণলালবাবুর ঠোঁটের প্রান্তে একটু হাসি খেলে গেল। এসব চালাকি তিনি বোঝেন—বিষয়ে লোভ নেই, এই কথাটাই যেন বিষয় পাবার বড় সুপারিশ।

তবু ত এরা ছেলেমানুষ—তাঁর বড় শালা, যে স্ত্রী আজ কুড়ি বৎসর মারা গেছেন, তাঁরই বড় ভাই যামিনীবাবুর ছেলেমানুষি দেখে কৃষ্ণলালের হাসি পায় সব চেয়ে বেশি। ভদ্রলোক কী একটা বড় চাকরি করতেন সরকারী অফিসে, মোটা টাকা পেন্সন পান, পয়সার অভাব নেই—তবু তাঁর লোভ যায় না। কিছুদিন আগে বড় ছেলেকে সরকারী চাকরী ছাড়িয়ে কৃষ্ণলালের একটা অফিসে ঢুকিয়েছিলেন, ভরসা ছিল যে ছেলে উন্নতি ক'রে কৃষ্ণলালের সুনজরে পড়বে। কিন্তু উন্নতি সে করতে পারেনি। কেরাণী সে, জাত কেরাণী। তার কাছ থেকে খাতা রাখা ছাড়া অন্য কোন কাজ কৃষ্ণলাল পাননি, ব্যবসা সে বোঝে না। এখন যামিনীবাবু সপরিবারে ছুটে এসেছেন, তাঁর বক্তব্য এই যে, সরকারী চাকরি ছাড়িয়ে ত তিনি ছেলেকে কেরাণীগিরি করার জন্য এখানে পাঠান নি, সুতরাং ভগ্নিপতির উচিত মরবার পূর্ব্বে ছেলেটার একটা সুরাহা ক'রে যাওয়া।

এছাড়া আরও কত লোক যে তাঁর কাছে অর্থ এবং আর্থিক উন্নতি দাবী করে, সে হিসাবও যেন কৃষ্ণলালবাবুর গুলিয়ে যাচ্ছে। শালা নিজের আরও দুটি আছে—তার ওপর মাস্‌তুতো-পিস্‌তুতো-খুড়তুতো শালা, পিস্‌তুতো ভাই, মামাতো ভাই—তাদের ছেলে-জামাই—এসব তো আছেই। তাঁর টাকা দিয়ে যাবার লোকের অভাব নেই, বরং একটু যেন বেশীই আছে সংখ্যায়। কিন্তু তাঁর চিন্তা অন্যত্র—বাঙালী ব্যবসাদাররা একপুরুষে ব্যবসা করে হাঁপিয়ে পড়ে, ছেলেরা ব্যবসা তুলে দিয়ে জমিদারি কিনে আরাম করতে বসে। চিরদিনই এ কলঙ্ক তাঁকে লজ্জা দিয়েছে—বাঙালী ব্যবসা করতে পারে না, এ গ্লানি তিনি অনেকটা দূর করেছেন; কিন্তু সে ব্যবসা যদি তাঁর

সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা তাঁর যেটা বেশি ভয়, মাড়োয়ারীরা যদি কিনে নেয় ত মৃত্যুর পরও তিনি শান্তি পাবেন না যে। এ লজ্জা, এ কলঙ্ক জীবনের অপর পারেও তাঁকে প্রতিনিয়ত বিঁধবে।

সত্যশরণবাবু খুব মৃদুকণ্ঠে একটু কাশলেন। মৃদু হ'লেও সে শব্দ কৃষ্ণলালবাবুর কানে পৌঁছতে দেরী হ'ল না। তিনি চোখ খুলে ওঁর দিকে চেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'এই যে বলছি, আর দেরি হবে না—। আর পাঁচ মিনিট সময় দাও সত্যশরণ!'

কিন্তু তারপরই আবার চোখ বুজে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। লোক নেই, কেউ নেই এমন, যাকে তিনি এই ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।...আজ যদি তাঁর ছেলেটা বেঁচে থাকত। তাকে তিনি নিশ্চয় মানুষ ক'রে তাঁর এই সব কাজের উপযুক্ত ক'রে তুলতেন, কখনই ওদের মত অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ, পরাশ্রয়ী হ'তে দিতেন না। ...যে ছেলে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, দশ বছর বয়সে হারিয়ে গেছে চিরদিনের মত, তারই শোকে এতদিন পরে যেন নতুন ক'রে কৃষ্ণলালের চোখে জল এসে পড়ল।

অথচ এ দুঃখ তাঁর ছিল না। তার কারণ বলতে গেলে স্ত্রী-পুত্র মারা যাবার পরই তিনি এই জীবন আরম্ভ করেছেন—এ তাঁর জন্মান্তর বলা যায়। আগে তিনিও চাকরী করতেন, মোটা মাইনের সরকারী চাকরি, আর তাইতেই তিনি খুশি ছিলেন, হয়ত-বা চাকরির গর্ব্বও করতেন। তারপর হঠাৎ একদিন সে চাকরির মোহ তাঁর চলে গেল। ছেলেকে অসুস্থ দেখেও অফিসের কাজে তাঁকে মফঃস্বল চলে যেতে হ'ল—ফিরে এসে শুনলেন যে ছেলে আর তাঁর নেই।

টাকার খুব অভাব ছিল না বটে, কিন্তু বন্দোবস্ত ক'রে উপযুক্ত চিকিৎসা করায়, সেই মুহূর্ত্তে এমন কেউ ছিল না। স্ত্রী একে মেয়েছেলে, তায় ছেলের অসুখে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জীবন-মৃত্যু মানুষের হাতে নয়, তা কৃষ্ণলালবাবু জানতেন, তবু তাঁর মনে হ'ল যে হয়ত তিনি উপস্থিত থাকলে এ বিভ্রাট ঘটতো না। অন্তত একমাত্র ছেলে বিনা চিকিৎসায় ম'ল, এ ক্ষোভ থাকত না তাঁর মনে।

সেই শেষ—তারপর কৃষ্ণলালবাবু আর অফিসে যাননি। ঘরে বসেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি ব্যবসায়ে মন দিলেন। প্রথমে কাপড়ের দোকান, তারপর পেট্রোল-পাম্প। কেরাণীগিরি ক'রে এসেছেন চিরকাল, ব্যবসা মাথায় ঢুকতে দেরী হয়। প্রথম প্রথম কৃষ্ণলাল অনেক ঘা খেয়েছেন; কিন্তু চেষ্টা আর নিষ্ঠা কোনদিন ছাড়েন নি, তাই অনেক ঝড়ঝাপটাতেও টিকে গেলেন। এই শালারা সেদিন তাঁকে বিদ্রূপ ক'রেছিল, তাদের বোন্‌কে পথে বসাবার জন্ত তিরস্কার করেছিল—অবশ্য তাতে কৃষ্ণলাল কোনদিনই বিচলিত হন নি। অধ্যবসায় ও সততা, এই দুটি জিনিষ থাকলে একদিন ব্যবসায়ে উন্নতি করবেনই—এ তিনি জানতেন। এমন কি, যখন সকলেরই মনে হয়েছিল যে দেউলে হ'তে আর তাঁর দেরি নেই, তখনও তিনি হাল ছাড়েননি, হা-হুতাশও করেন নি। সর্ব্বস্ব পণ ক'রে স্থির হয়ে ব্যবসা করছিলেন।

তারপর, যেদিন মনে হ'ল লক্ষ্মী এইবার প্রসন্ননেত্রে চেয়েছেন তাঁর দিকে, শুভদিনের সেই সূচনায় তাঁর জীবনসঙ্গিনী গেল হারিয়ে। মাত্র তিন দিনের জ্বরে স্ত্রী মারা গেলেন, জলের মত অর্থব্যয় ক'রও তাঁকে বাঁচানো গেল না। সেদিন, তাঁর সমস্ত

আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের বিনিময়েও যদি স্ত্রীকে বাঁচানো যেত ত তিনি বোধ হয় সেই সব-কিছু বিসর্জ্জন দিতে ইতস্তত করতেন না। কিন্তু তাই ব'লে স্ত্রী মরবার পর তিনি এলিয়ে পড়েননি, টাকার নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল সেদিন—সেই নেশাতেই তিনি এত বড় গভীর শোকও ভুলে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে—ধুলিমুঠো ধরতে গেলেও তা সোনামুঠো হয়ে যাচ্ছে। সার্থকতাই উৎসাহ জোগায়—একটা ব্যবসা থেকে আর একটায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন তিনি, কখনও ক্লান্তি বা নিরুৎসাহ বোধ করেননি। সেদিন তিনি একাই ছিলেন যথেষ্ট।

তবু, হয়ত তাঁর একার দ্বারা এতটা উন্নতি সম্ভব হ'ত না; কিন্তু ভগবান সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই একটি লোক দিলেন। সে-ও প্রায় বছর পনেরো আগেকার কথা হ'ল—যখন এতখানি পরিশ্রম সবে কষ্টকর বলে মনে হতে শুরু হয়েছে, সেই সময় তাঁর ভাগ্নে উমাশঙ্কর হঠাৎ বাপ মারা যাওয়ার পর তাঁর কাছে এসে পড়ল। বছর আঠারো বয়স তখন তাঁর, ম্যাট্রিক পাস করে সবে কলেজে ঢুকেছে। উমাশঙ্করের মা তাঁর খুড়তুতো বোন, তার ওপর সে-ও বহুদিন নেই, সুতরাং এই ছেলেটির খবর পর্য্যন্ত তাঁর জানা ছিল না, নিতান্ত আশ্রিত হিসাবেই এসে পড়েছিল; কিন্তু ছেলেটিকে পেয়ে খুশি হয়েছিলেন তিনি—খুবই খুশি হয়েছিলেন। সুদর্শন, বুদ্ধিমান এবং চটপটে—তাঁর সমস্ত অন্তর বলে উঠল এই ছেলেটিরই প্রত্যাশা করে বসেছিলেন তিনি এতদিন—তাঁর স্নেহ-বুভুক্ষু মন একান্তভাবে এই তরুণ ভাগিনেয়টিকেই সেদিন আঁকড়ে ধরেছিল।

উমাশঙ্করও তাঁর স্নেহ ও বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করেনি। কৃষ্ণলাল তাঁকে কলেজ ছাড়িয়ে নিজের কাছে নিয়ে এলেন—নিজের সেক্রেটারী হিসাবে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে তাঁর সমস্ত ব্যবসায়ের মূল কথাগুলি আয়ত্ত করে নিলে—সব যায়গায় যাওয়া, ছুটাছুটি করা, হিসাবপত্র দেখা, নতুন কন্‌ট্র্যাক্ট; নতুন টেণ্ডার আলোচনা করা, কর্ম্মচারীদের চুরি এবং ফাঁকি ধরা প্রভৃতি ব্যাপারে সে তাঁর দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠ্‌ল। পাঁচ বছর যেতে না যেতেই কৃষ্ণলাল স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন যে, একদিন এই ছেলেটির ওপরই তাঁর সমস্ত বিষয়কর্ম্মের ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজে অবসর নেবেন—আরাম করবেন।

হায় রে! আজ যদি উমাশঙ্কর তাঁর কাছে থাকত—কৃষ্ণলালের সমস্ত অন্তর যেন হাহাকার করে উঠ্‌ল—আজ সে থাকলে তাঁকে ভাবতে হ'ত না এ বিষয় কাকে উইল করে দিয়ে যাবেন, কার হাতে তিনি এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের ভার তুলে দিয়ে চিরদিনের মত অবসর নেবেন! এমন কি, হয়ত তাহ'লে একা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তাঁকে আজ অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেও হ'ত না! আজ তিনি সুস্থদেহে কোন ঠাণ্ডা দেশে বসে আরাম করতে পারতেন।

অথচ—

অথচ সে উমাশঙ্কর আজও বেঁচে আছে, এই কলকাতা শহরেরই এক অন্ধকার গলিতে ততোধিক অন্ধকার ঘরেতে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করছে। যে বড় বড় বিলিতী ফার্ম্মের মাথায় বসে চালাতে পারে—সে কি না সামান্য বেতনে কেরাণীর কাজ করছে। এই বিপুল সম্পত্তি আজ যার অভাবে নষ্ট হতে চলেছে, সে আজ দরিদ্র। এর চেয়ে অদৃষ্টের আর কি পরিহাস থাকতে পারে! যে হাত

তলোয়ার ধরতে পারে অনায়াসে, সেই হাত আজ নাপিতখানায় বসে ক্ষুর ধরেছে !

হয়ত দোষ সেদিন কৃষ্ণলালেরও ছিল খানিকটা, তবু সেদিন যে তিনিই সমস্ত অন্যায় করেছেন, এমন কথা আজ মৃত্যুশয্যাতে শুয়েও কৃষ্ণলাল মান্‌তে রাজী নন। এ পৃথিবীতে সকলেরই সুখী হবার অধিকার আছে—খালি তাঁর নেই ? তিনি চিরদিন সকলের উপকার করে গেলেন নিঃশব্দে, বিনাবিচারে—তার পরিবর্তে কোথাও এতটুকু কৃতজ্ঞতা তিনি দাবী করতে পারেন না ?

কথাটা মনে হ'লে আজও তাঁর সমস্ত দেহের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, অন্তরের সমস্ত তৃষ্ণা ক্ষোভে, বেদনায় মাথা কুট্‌তে থাকে।

কোথায় ছিল উমাশঙ্কর আর কোথায় ছিল নীলা—তিনি যদি নিতান্ত অনাথ হিসাবে ওদের আশ্রয় না দিতেন, তাহলে ওরা পরস্পরকে পেত কি করে ? সে কথা, সে কথাটা তারা একবারও ভাবতে পারলে না ?

নীলা ওঁরই বন্ধু এবং কর্ম্মচারী অদ্বৈতদয়ালের মেয়ে। আগে সে তাঁরই সঙ্গে সরকারী অফিসে কাজ করত, কাজের লোক বলে অনেক বেশী টাকা মাইনে দিয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে আনেন। অদ্বৈত-দয়ালের সঙ্গে কোথায় তাঁর আর একটা সহানুভূতিরও বন্ধন ছিল—সেও বিপত্নীক। সংসারে তার থাকবার মধ্যে ছিল ঐ একটি মেয়ে নীলা—বড় আদরের মেয়ে! অদ্বৈতদয়ালের কি প্রচণ্ড স্নেহ ছিল মেয়ের ওপর তা কৃষ্ণলাল জানতেন, তাই মরবার সময় সে যখন মেয়ের ভার তাঁর ওপরই দিয়ে গেল, তখন তিনি নীলাকে তার কোন আত্মীয়ের

হাতে দিয়ে মাসোহারা পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি—তাকে কাছে এনেই রেখেছিলেন।

নীলার তখন মাত্র বছর পনেরো-ষোল বয়স। আর বছরখানেক গেলে ভাল পাত্র দেখে তার বিবাহ দিয়ে দায়মুক্ত হবেন, এই ছিল সেদিন তাঁর ধারণা। ওর বাপও কিছু রেখে গেছে—তিনিও কিছু দেবেন, সত্যকারের সুপাত্রের অভাব হবে না।......সেদিন তিনি একবারও ভাবেন নি যে, এই একফোঁটা মেয়েটিই তাঁর সর্ব্বনাশ করবে!

রূপ?

না, রূপ নীলার ছিল না। কোথাও কোন অসাধারণত্ব ছিল না। তবু সে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণলালের মনোরাজ্যে এক বিপর্য্যয় ঘটে গেল। এই নিতান্ত সামান্যা মেয়েটিই তাঁকে অভিভূত করে ফেললে—

কৃষ্ণলালের স্ত্রী মেখলা বরাবরই একটু অপটু ছিলেন—স্বামীর সেবার ছোটখাট কাজ কোনদিন তিনি গুছিয়ে করতে পারেন নি, দাসী-চাকরেই করেছে। তারপর মেখলা মারা যাওয়ার পর ত কথাই নেই—ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মধুলোভী মধুকরের মত আত্মীয়েরা এসে জুটেছে অসংখ্য—তাদের সেবা করবার একটা অভিনয় ছিল, আন্তরিকতা ছিল না। ফলে কৃষ্ণলালকে চিরদিনই ভৃত্যদের হাতের সেবা নিয়েই খুশী থাকতে হয়েছে। তা-ও, সেখানেও তিনি জোর করতে পারতেন না, যেটুকু তারা দয়া করে দিত, তাই-ই হাত পেতে নিতেন।

কিন্তু নীলা আসবার পরই সব ওলট-পালট হয়ে গেল। তার বাবার অবস্থা ভালই ছিল, সেখানেও দাসী-চাকরের অভাব ছিল না, তবু সে তার বাবার সব কাজই নিজে হাতে করেছে। এখানেও সে

কৃষ্ণলালের সমস্ত কাজ নিজে তুলে নিলে। কৃষ্ণলালের সবই অদ্ভুত লাগে—এখন বেলা তিনটের সময় খেতে এসেও দেখেন, ভাত-ডাল সব গরম, রাত তিনটেতে ফিরলেও দেখেন আরক্ত এক জোড়া চোখ তখনও জেগে বসে আছে। তিনি তিরস্কার করেন, বকাবকি করেন, অনুযোগ করেন—কোনও ফল হয় না। ঐটুকু মেয়ের অনিয়মে অসুখ করবে বলে তাঁকেই শেষ পর্য্যন্ত নিয়মে চলতে হয়। আগে একশ'টা স্যুটের একটাও দরকার মত হাতের কাছে পাওয়া যেত না, এখন মনে হয় এত পোষাকের দরকার নেই। কোন একটা পোষাক নীলা তাঁকে দুবার পরতে দেয় না। শুধু জামা-কাপড়-জুতোই নয়, কাগজ-পত্র, হিসাবের খাতা, চুরুটের বাক্স, ওষুধ প্রত্যেকটি জিনিষ হাতের কাছে জোগানো থাকে। নীলা তাঁর মুখ দেখলে বুঝতে পারে তাঁর কি চাই। ......শুধু তাই নয়, ছ'মাস না যেতে যেতে নীলা তাঁকে শাসন করতে শুরু করে—অগোছালো হলে চলবে না, অনিয়ম করলে ভুগবে কে ?

এ অভিজ্ঞতা কৃষ্ণলালের নতুন বৈ কি! বিস্ময়কর শুধু নয়—বিভ্রান্তকরও বটে। তিনি এ শাসন ত মাথা পেতে নিলেনই, তাঁর মনে হল তাঁর অন্তর সারাজীবন এই শাসনটির জন্যই তপস্যা করছিল। পরিবারের আর সকলের কাছেই এটা ন্যাকামি বলে মনে হ'ত, কিন্তু কৃষ্ণলাল আন্তরিকতার চেহারা চিনতেন। ক্রমে তাঁর কাছে টাকাকড়ি, যশ সব কিছুই অর্থহীন বলে মনে হতে লাগল—মনে হ'ল মানুষের শেষ লাভ অন্তরে, সবচেয়ে বড় পাওয়া হল হৃদয়ের পাওয়া, তার কাছে আর সবই অকিঞ্চিৎকর। এখন অফিসে বসে কাজ ভুল হয়ে যায়—নীলার কথা ভাবেন বসে বসে, কি জিনিস কিনে নিয়ে গেলে নীলা খুশী হবে,

এ চিন্তা তাঁর বড় একটা টেণ্ডারের আলোচনার চেয়েও বেশীক্ষণ মনকে ব্যস্ত রাখে।

তার ফলে পরের বৎসর নীলার বিয়ে দেওয়া ত হ'লই না—তার পরের বৎসরও না। তিন বৎসর কেটে গেল, পাত্রের সন্ধান পর্য্যন্ত করা হল না। এতদিন নীলাকে ঠিক কিভাবে তিনি ভালবাসেন, ভেবে দেখার চেষ্টাও করেন নি—প্রশ্নটাকে বরাবর এড়িয়ে গেছেন। এইবার তিনি মনের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, নীলা তাঁর পক্ষে অপরিহার্য্য, তাকে তিনি ছেড়ে দিতে পারেন না অন্য কোথাও। নীলার সঙ্গ তিনি চান—তিনি চান তার সেবা, এইটাই বড় কথা, কিন্তু কন্যারূপে তাকে যে কাছে রাখা যাবে না চিরকাল, এটাও ঠিক। তবে ?—

তবে কি তিনি নীলাকে বিবাহ করতেই চান ? এই বয়সে ? এখন ?······

ক্ষতি কি ? চল্লিশ পেরিয়েছে বটে, কিন্তু তিনি একটুও অথর্ব্ব হন নি, বরং যথেষ্ট শক্তি এখনও তাঁর আছে—যৌবনের উদ্যম-উৎসাহ কিছুমাত্র কমেনি।··· কত লোক ত দ্বিতীয় পক্ষ করে, কত লোক এই বয়সে প্রথমবারই বিয়ে করেছে। তবে ? নীলাকে তিনি বিয়েই করবেন।

মন স্থির করবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা আকুল এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে যেন উন্মত্ত করে তুললে। শুধু যে নীলার সাহচর্য্য তিনি চান না—তিনি তাকেও চান, তার যৌবনের প্রতিও তাঁর মোহ একটা জন্মেছে মনে মনে, এ কথাটা এতদিন পরে তিনি নিজের কাছেও স্বীকার

করতে বাধ্য হলেন···নীলাকে তাঁর চাই-ই—এতদিনের সমস্ত ক্ষতি তিনি পূরণ করে নেবেন ওর প্রেমে। এত কষ্টে উপার্জ্জিত এই যে বিপুল ঐশ্বর্য্য—একজনের পায়ের কাছে স'পে দিয়ে সার্থক হবার মত মানুষ তিনি পেয়েছেন এতদিন পরে—তাকে তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারবেন না। জন্ম-জন্মান্তরের ক্ষুধা নিয়ে তাঁর অন্তরের পুরুষ আজ জেগেছে, অমৃতরূপিণী ঐ নারীকে তাঁর চাই-ই।···

নীলার তরফ থেকে যে কোন আপত্তি থাকতে পারে—একথা তাঁর একবারও মনে হয় নি, স্বার্থপর মন নিজের দিকটাই ভাবছিল শুধু। তা-ছাড়া, তার এত যত্ন, এত সেবা, এত ঐকান্তিকতার মূলে যে সেই বিশেষ ভালবাসার আভাস মাত্র নেই, তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। তাই একদা যখন নীলাকে কাছে ডাকিয়ে একথা সেকথার মধ্যে আসল কথাটা পেড়ে ফেললেন, তখন একটা লজ্জার নিবিড় রক্তিমাই শুধু তার কাছে আশা করেছিলেন।······আর, আর বোধ হয় আশা করেছিলেন, একটা সুখের, একটা আত্মসমর্পণের চাহনি তার চোখে—

নীলা লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল বটে, কিন্তু ঠিক এই শ্রেণীর লজ্জা কৃষ্ণলাল কল্পনা করেন নি। নীলা প্রথমে মনে করেছিল ঠাট্টা, সে মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠে শুধু বললে, 'এ আবার কি ঠাট্টা কাকাবাবু, আপনাকে না কাকা বলি?'

কিন্তু কৃষ্ণলাল যখন তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ঠাট্টা তিনি করেন নি—নীলার কাছে তাঁর অন্তরের কথাই বলেছেন, নীলাকে তিনি কোনমতেই কাছছাড়া করতে পারবেন না—কাকা বললেই কাকা হয়

না, সত্যকারের সম্পর্ক যখন নেই, তখন কিছুতেই বাধে না—তখন সে আর একটাও কথা বললে না, মুখ অন্ধকার করে উঠে চলে গেল।

তবু তখনও কৃষ্ণলাল হাল ছাড়েন নি। ওটা একটা 'শক' মাত্র—সময়ে নীলা সামলে নিতে পারবে এবং ব্যাপারটা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে অবস্থাটা মেনে নেবে—এই কথাটাই তিনি ভেবেছিলেন।

আসল কথাটাও তিনি সেদিন বুঝতে পারেন নি, পারলেন তার পরের দিন দুপুরবেলা—যখন উমাশঙ্কর তাঁর কাছে কথাটা পাড়লে। সে চায় নীলাকে বিবাহ করতে, স্বজাতি, পাল্‌টি ঘর—আপত্তির কিছুই নেই। সে বিবাহ করলে নীলা মামাবাবুর কাছেই থাকতে পারবে, এই বয়সে তাঁকে দেখাশুনা করার লোকেরও অভাব হবে না—ইত্যাদি। তাছাড়া ওরা পরস্পরকে এ সম্বন্ধে বাগ্‌দত্ত আছে, ওদের ভেতর কথাটা স্থির হয়ে গেছে আগেই!

তারপরের কথাটা আজও কৃষ্ণলালের ভাল করে মনে পড়ে না। হয়ত তখন তাঁর যে সংযম, যে স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল, তা তিনি দিতে পারেন নি। হয়ত নিজেকে অতটা নীচু না করলেও চলত, কারণ ধরে রাখতে ত পারলেন না ওদের শেষ পর্য্যন্ত!

হ্যাঁ, তিনি সেদিন জ্ঞান হারিয়েছিলেন, অসংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তবু, তিনি কি এমন একটা ভয়ানক কিছু অন্যায় করেছিলেন? যাকে জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা বলে মনে হয়েছিল, তা যদি হাতের মধ্যে এসেও এমন করে মিলিয়ে যায়, অমৃত যদি ওষ্ঠের প্রান্তে পৌঁছেও ফিরে যায়—তাহলে মানুষের ধৈর্য্য রাখা একটু কঠিন হয়ে পড়ে বৈ কি। আকাঙ্ক্ষা, বাসনা অতটা তীব্র ছিল বলেই আশাভঙ্গের বেদনা সেদিন তাঁকে অতটা আঘাত করেছিল—এতে যদি

কোন অপরাধ হয়ে থাকে ত মানুষের অন্তর্য্যামী তা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। তিনি—তিনি এমন আর বেশী কি চেয়েছিলেন মানুষের কাছে, একটু কৃতজ্ঞতা, এই ত'!...... এতটুকু ত্যাগ স্বীকারও কি তারা করতে পারত না?

তারপর ?

তারপর আর কি—উমাশঙ্কর একদিন নীলাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। আঠারো বছর বয়স পার হয়ে গেছে নীলার ; সুতরাং তিনি আর তাকে বাধা দিতে পারেন না—এতবড় কথাও নীলা তাঁকে শোনাতে ইতস্তত করে নি।...সে আঘাত কৃষ্ণলাল সহ্য করেছিলেন ; কিন্তু তাদের ক্ষমা করেন নি। তার জন্য তাঁকে সেই দারুণ আশাভঙ্গের ব্যথা বুকে নিয়েও আবার নতুন করে সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিতে হয়েছিল—কিন্তু সহ্য তিনি করেছিলেন মানুষের মতই। উমাশঙ্করকে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, নীলাকেও তার পৈত্রিক অর্থের বেশী একটি পয়সাও দেন নি। হয়ত সেটা ছেলেমানুষীই হয়েছিল সেদিন। তবে তার মূল্যও তিনি বড় কম দেন নি। অতিরিক্ত পরিশ্রম করে আজ অসংখ্য রোগ তিনি ডেকে এনেছেন—এই অকালেই তাঁকে মৃত্যুপথযাত্রী হতে হয়েছে।

অবশ্য উমাশঙ্করদের খবর তিনি রেখেছিলেন। এধারে যত কাজই সে করে থাকুক—সরকারী বিদ্যার তকমা ছিল না তার, তাই খুব সামান্য মাইনেতেই তাকে অন্য অফিসে চাকরীতে ঢুকতে হয়েছিল, তাও অনেকদিন পরে। বেকার অবস্থার জন্য আর সামান্য বেতনের জন্য নীলার টাকা ক-টাও উড়ে যেতে বছর দুই-এর বেশী লাগে নি ; তারপর আরও দুরবস্থা। কিন্তু তবু মাথা নোয়াবার লোক ওরা নয়। আরও

বছরখানেক পরে অপমানবোধের চেয়ে স্নেহেরই জয় হয়েছিল—কৃষ্ণলাল অপরের মারফৎ এই সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে, নীলা নিজে এসে যদি তাঁর কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে তিনি ওদের একটা মোটা মাসোহারার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন্। কিন্তু নীলা তার উত্তরে জানিয়েছিল, 'ওঁর স্নেহ যদি আবার কোনদিন দিতে পারেন ত মাথা পেতে নেবো। যে পয়সা দিয়ে আমার ভালবাসা উনি কিন্‌তে চেয়েছিলেন, সে পয়সাতে আমাদের দরকার নেই।...তাছাড়া অন্যায় আমরা কিছুই করিনি—ক্ষমা চাইব কেন ?'

নীলাকে তিনি ভাল করেই চিনেছিলেন—সে মাথা কোনদিন জোর করে নোওয়ানো যাবে না। সামনে না থাকলেও ঐ কথাগুলো বলবার সময়ে তার চোখ দিয়ে যে আগুন ঠিকরে বেরিয়েছিল, তা আজও কৃষ্ণলাল কল্পনা করতে পারেন। সে চোখ তিনি কোনদিন ভুলবেন না!

সত্যশরণ খুব আস্তে ডাকলেন—'কৃষ্ণলাল' !

ক্লান্তকণ্ঠে কৃষ্ণলাল উত্তর দিলেন, 'জানি সত্যশরণ তোমার সময়ের দাম আছে। কিন্তু আমার সময় যে আর একেবারেই নেই।......এত দিনের যা কিছু সম্বল, স্নেহহীন, ভালবাসাহীন জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, কঠিন পরিশ্রমের ফল—ফেলে রেখে আজ যাত্রা করতে হবে চিরকালের মত একটু ভাবব না যে, কার হাতে সেটা ফেলে রেখে যাবো ?'

সত্যশরণ চুপ করে গেলেন। ইউরোপীয়ান নার্স পাশের ঘরে কি-কি করছিল, নিঃশব্দে এসে টুলের ওপর বসল। কেরাণী একটা বইএর পাতা ওলটাতে লাগল অত্যন্ত বিরক্তিভরে।

কৃষ্ণলাল আর একবার মনে মনে তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। কেউ নেই, কেউ নেই—তাঁর আত্মীয়-স্বজন কেউ নয় তারা। সব অপদার্থ পরাশ্রয়ী পরান্নজীবীর দল।

টাকা কি রামকৃষ্ণ মিশনে দিয়ে যাবেন? কিংবা অন্য কোথাও? যে কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে?

নগদ টাকা দিতে পারেন তাদের—কিন্তু ব্যবসা?……

মন ঘুরে ফিরে আবার সেই গভীর ক্ষতের স্থানটিতেই ফিরে এল।……হ্যাঁ, নীলার চোখে সেদিন আগুনে জ্বলেছিল, নিশ্চয়ই জ্বলেছিল। সে আগুন তিনি দেখেন নি, তবে ভাবতে পারেন।… সুন্দর চোখ তার নয়—তবু সে চোখ দুটির ওপর কৃষ্ণলালের বড় লোভ ছিল।……সেই চোখ দুটির উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তাঁর পথ চেয়ে ওপরের ঘরের বাতায়নপথে অপেক্ষা করছে—এই কথাটা ভাবতে ভাল লাগত বলে তিনি কতদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে বাড়ি ফিরেছেন ইচ্ছে করে।…

অনেকদিন তাকে দেখেন নি। নীলাকে।…কেমনে সে দেখতে হয়েছে কে জানে! তার নাকি তিনটি ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে।…… সেই একরত্তি নীলার। আশ্চর্য্য!

কতদিন ধরে তিলে তিলে এই প্রচণ্ড বাসনা তাঁর মনে জমা হয়েছিল কে জানে—তিনি অর্থের বিনিময়ে পৃথিবীর সব দেশের সুন্দরী মেয়েকে ভোগ করতে পারতেন—কিন্তু তাতে তাঁর লোভ ছিল না। ঐ শ্যামাঙ্গী, তন্বী মেয়েটিকেই তিনি কামনা করেছিলেন একান্তভাবে, একটা পুরুষের মনে যতটা ইচ্ছা থাকতে পারে সব দিয়ে। জীবনে আর কখনও এমন করে তিনি কিছু চান নি—কোন জিনিস না, কোন মানুষকে না!

আচ্ছা, নীলার এতটুকু মায়া হল না তাঁর ওপর, এতটুকু স্নেহ না? তাঁর সেদিনের সে সর্ব্বহারা মুখের চেহারা এতটুকু করুণা জাগাতে পারল না!……কেন, তাঁর দোষ কি? তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন?…… না, দৃঢ়কণ্ঠে কৃষ্ণলাল মনে মনে বললেন, বৃদ্ধ তিনি সেদিন হন নি। হয়ত যৌবনের প্রথম স্বপ্ন আর তাঁর চোখে ছিল না—তবু বৃদ্ধ তাঁকে কেউ সেদিন বলতে পারত না!……শুধু, শুধু ঐ উমাশঙ্কর যদি তার সামনে না থাকৃত! তরুণ রূপবান উমাশঙ্কর। যার ওপর সব চেয়ে বেশী অশা ছিল কৃষ্ণলালের, যার হাতে যথাসর্ব্বস্ব তুলে দিয়ে যেতে পারতেন!

আচ্ছা, তিনি মরবার পর সে খবর পেয়েও কি নীলার মন একটু কোমল হবে না, সেই আশ্চর্য্য চোখ দুটিতে এতটুকু বেদনার ছায়া নামবে না! একদিন তাঁর অভাবে সেই চোখ দুটি কান্নায় আকুল হয়ে উঠ্‌বে—এই স্বপ্ন তিনি দেখতেন। আজ আর অতটা আশা করেন না—কিন্তু দু-ফোঁটা চোখের জল, দুটি বিন্দু অশ্রুও কি তিনি দাবী করতে পারেন না?

অকস্মাৎ যেন এতদিন পরে কৃষ্ণলালের মনে সেদিনের সেই উদগ্র ক্ষুধা নতুন ক'রে জেগে উঠ্‌ল। জীবনে তিনি কিছুই পেলেন না— মরবার পর সেই দুটি চোখের দুটি ফোঁটা জলও কি তিনি পেতে পারেন না—কোনমতে, কোন রকম করে? নীলা কাঁদবে, শুধু তাঁর জন্য, সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত বেদনার ইতিহাস মুছে গিয়ে শুধু মানুষের সম্পর্কটা মনে থাকৃবে তার—আর সেই মানুষটার জন্যই তার চক্ষু আসবে সজল হয়ে। কোনমতে এটা কি সম্ভব হয় না?

কিন্তু এ যে চাই-ই তাঁর! এটুকু পাথেয় না নিয়ে চিরদিনের মত যাত্রা করবেন তিনি কি করে—কিসের ভরসায়?

আচ্ছা, একদিন তিনি টাকা দিয়ে তার ভালবাসা কিনতে গিয়েছিলেন সত্য কথা—কিন্তু পান নি। আজ আর একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? ভালবাসা নয়, দু-ফোঁটা চোখের জলও কিনতে যদি না পারে ত সে অর্থের মূল্য কি? তিনি যদি যথাসর্বস্ব ওদেরই হাতে তুলে দিয়ে যান, তবু কি নীলা বুঝতে পারবে না কতখানি ভালবাসায় এটা সম্ভব হয়েছে যে, তাঁর প্রতি যারা অন্যায় করেছে, অবাধ্য হয়েছে, তিনি তাদেরই কাছে মাথা হেঁট করে তাঁর সব কিছু দিয়ে গেছেন। নিঃশব্দে, কিছুর আশা না রেখেই তিনি তাদের ক্ষমা করে গেছেন!

তবু কি তার মনে এতটুকু ব্যথা জাগবে না, এতটুকু অনুতাপ? সেদিন যে কি একান্ত ভাবে চেয়েছিলেন তাকে তা কি সে বুঝবে না? সেদিন তিনি টাকা দিয়ে কিনতে চান নি তার প্রেম—ভিক্ষা চেয়েছিলেন মাত্র।

আছে, সে তন্ত্রী তার মনোবীণায় আছে, নইলে কৃষ্ণলাল চিরদিন তার দ্বারে ভিখারী থাকতেন না।...

দারুণ উত্তেজনায় কৃষ্ণলালের দেহ থর থর করে কেঁপে উঠল। তিনি যেন প্রাণপণ শক্তিতে সহসা কনুয়ে ভর দিয়ে খানিকটা উঠে বসলেন, 'সত্যশরণ, লিখে নাও, লিখে নাও—আর সময় নেই! মন আমি ঠিক করেছি।'

নার্স তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ধরে শুইয়ে দিলে। বোধ হয় কি একটা মৃদু তিরস্কার করলে—কিন্তু সেদিকে তাঁর কান ছিল না। তিনি বললেন, 'সত্যশরণ লিখে নাও—আমার সব আত্মীয়দের লিস্ট্ তোমার কাছে আছে ত? বোধ হয় পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ আর

সাতাশজন মেয়ে, না ? ওরা প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা করে নগদ পাবে। আর আমার সমস্ত কর্ম্মচারী, মায় মিলের লোক, বাড়ির ঝি-চাকর সবাই পাবে এক বছরের করে মাইনে। লিখেছ ? রামকৃষ্ণ মিশন, মেডিক্যাল কলেজ আর যক্ষ্মা হাসপাতাল এরা এক লক্ষ টাকা করে পাবে—এছাড়া আমার যা কিছু স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, মায় কারবার, মিল, শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ, বাড়ি-ঘর-দোর যা কিছু সব আমার ভাগ্নে উমাশঙ্কর আর তার স্ত্রী নীলা পাবে। শুধু তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, তারা যেন এই বাড়িতে বাস করে, আর আমার যে সব মাসিক দান ছিল, সম্ভব হলে সেগুলো চালিয়ে যায়।···ব্যস্। এই—'

কেরাণী দ্রুতহস্তে লিখে যাচ্ছিল। সত্যশরণ বললেন, 'কোন সর্ত্ত রাখতে চাও না ত ? ভেবে ছাখো—'

এতখানি উত্তেজনার পরে কৃষ্ণলাল অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সেই অবস্থাতেই আচ্ছন্নভাবে যেন বললেন, 'সর্ত্ত ? ঐ যে বললুম—দু-ফোঁটা চোখের জল, আর কিছু না !'

সত্যশরণ ভাল ক'রে শুনতে পেলেন না। প্রশ্ন করলেন—'কি, কি বললে ?'

ততক্ষণে কৃষ্ণলাল একটু সামলে নিয়েছেন। বললেন, 'না, না—ও কিছু না, কোন সর্ত্ত নেই। কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ড্রাফ্‌ট্ আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নাও—এই নার্স আর পাশের ঘরে ডাক্তার আছে, সাক্ষী থাকবে। কে জানে, যদি দলিল তৈরী হওয়া অবধি না বাঁচি—

অপবাদ

রাগ ও উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নলিনী যেন হাঁপাইতে লাগিল। উপর দিকে মুখ করিয়া চাপা অথচ তীব্র কণ্ঠে আঙুল মটকাইয়া গালাগালি দিতে লাগিল, 'আবাগী শতেকখোয়ারীরা মর মর, তোরা মর। তোদের ওলাউঠো হোক—গাদার মড়ায় যা তোরা আমি দেখি। বজ্রঘাত হোক তোদের মাথায়—'

বাস্তবিক তাহার রাগের কারণও ছিল। বাড়ীটায় কী করিয়া কথাটা রটিয়া গিয়াছে যে নলিনী একটি আস্ত চোর, চুরি করাই তাহার পেশা। তাহার ফলে আজকাল সে ঘরের বাহির হইলেই চোখে চোখে একটা ইশারা হয়—নিঃশব্দে যেন একটা টেলিগ্রাফ চলিতে থাকে—'ওগো, তোমরা সাবধান হও! চোর বেরিয়েছে।'

এসবই নলিনী বুঝিতে পারে। তবু এতদিন একরকম সহিয়াছিল কারণ ইশারাটা চাপাই ছিল, অপবাদটা তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিতে কেহ সাহস করে নাই। ইদানীং আর ইঙ্গিতটা শুধু চোখে সীমাবদ্ধ থাকিতেছে না—সোজাসুজি ভাষায় রূপ ধারণ করিয়াছে। এইত আজই—খাওয়া দাওয়ার পর নলিনী ছাদে উঠিয়াছিল কাপড়টা তুলিয়া আনিবে এবং তোষকটা রোদে দিবে বলিয়া। কিন্তু যেমন সিঁড়িতে পা দিয়াছে অম্‌নি কানে গেল নীচের তলায় আর এক ভাড়াটে পারুলের মা উপরের নন্দরাণীকে ডাকিয়া বলিতেছে, 'ও নন্দ—ঘর দোর সব সাম্‌লে সুম্‌লে রাখিস বাপু, যেন বেহুঁস্ হয়ে অন্য ঘরে গিয়ে আড্ডা দিস্‌নে সব ফেলে রেখে।' নন্দরাণীও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল 'আমি ঠিক আছি মাসী। ছাখো না কাণ্ড যত

নীলিমার—ঘরদোর হাঁ হাঁ করছে, কোথায় গেছেন। বোধহয় ছাদে গিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। নীলিমা, অ নীলিমা!'

পারুলের মা বলিল, 'হ্যাঁ তাই ডেকে দে বাবু—যা দিন-কাল পড়েছে, একটা পয়সা নয় একটা মোহর। আমাদের এঁনাদের হ'ল মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা—চুরির ত নয়। গেলে বড় লাগে।' তেতলার বাঙ্গাল গিন্নী দোতলায় আসিয়াছিলেন একটু দোক্তা চাহিতে, তিনিও গলা বাড়াইয়া চোখটা টিপিয়া কহিলেন, 'তা যা বলেছ ভাই। এ বাড়িতে থাকা যেন প্রাণ হাতে করে। মেয়েছেলে হয়ে যে চুরি করে, তার খুন করতেই বা কতক্ষণ? যাই —আমার আবার ওপরে ছিষ্টি খোলা আছে—ছেলেমেয়ে গুলো ত ঘুমে অচৈতন্য, হাতী মাড়ালেও ঘুম ভাঙ্‌বে না।'

এমনি করিয়া আক্রমণ চলিয়াছে সমস্তক্ষণ। ছাদে পৌঁছিয়াও নলিনীর কানে গেছে ইহাদের রসনা বিষ উদগার করিয়াই চলিয়াছে। তাহার নাম করা হয় নাই সত্য কথা, তবে এ আক্রমণের লক্ষ্য যে সে-ই এ কথা বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না।

কিন্তু কেন? হ্যাঁ—রাগে নলিনীর সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে—হ্যাঁ, চুরি সে করিয়াছে ঠিক কথা। কিন্তু তাহার অবস্থায় পড়িলে উঁহারা কি করিতেন? চুরি উঁহারা করেন না বটে তবে উঁহারা যে তাহার সুদ সুদ্ধ পুষাইয়া লইতেছেন। ঐত বাঙ্গাল গিন্নীর বর, অফিসে রেশনশপের ভার বুঝি উঁহার উপর—চুরি করিয়া আনেনা এমন জিনিষই নাই। চাল ডাল, ঘি-তেল—প্রায় সমস্ত সংসারের জিনিষটাই সে বহিয়া আনিতেছে চুরী করিয়া। পারুলের বাপ ত অফিস হইতে লোহার পাইপ আর রং উজাড় করিয়া আনিল। দোষ তাহাতে

নাই—না? নীলিমার বর শিয়ালদার চেকার, সে নাকি রোজই উপরি পায়—উপরিটা কি বাপু? চুরি ছাড়া কি আর কিছু? তাহার বাহির হইতে চুরি করিবার উপায় নাই—তাহার স্বামী যে কাজ করে তাহাতে উপুরি নাই, মাগ্‌গি ভাত্তা নাই—সে সংসারটা চালায় কি করিয়া? চাহিলে কি উহারা দিত? এক আধদিন এক আধটা জিনিস যে সে না চাহিয়া দেখিয়াছে তাহা নয় কিন্তু চাহিলে সবাই বিরক্ত হয়। মিথ্যাকথা বলিয়া এড়াইয়া যায়। তা ছাড়া বারোমাস চাহিয়া চলেই বা কি করিয়া? এই ত সবই বলাবলি করে, "বড় বড় সরকারী আফিসে কত লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি চলিতেছে—মানুষের মুখের অন্ন চাল—সেই চাল লইয়া কি কাণ্ডই না হইতেছে, কত চুরি, কত মিথ্যা বিল—কত জুয়াচুরি। কৈ তাহাদের মুখের উপর কেউ বলিয়া আসুক দেখি অমনি করিয়া, সে সাহস ত কাহারও নাই, যত নির্য্যাতন বুঝি সে গরীব বলিয়া, অসহায় স্ত্রীলোক বলিয়া?

অথচ, ক্ষোভে দুঃখে নলিনীর চোখে জল ভরিয়া আসিল, যত দিন তাহার বিক্রি করিবার মত একটা জিনিষ ছিল, ততদিন সে কাহারও কাছে হাত পাতে নাই কিংবা না বলিয়া কাহারও একটা ফেলিয়া দেওয়া জিনিষ পর্য্যন্ত নেয় নাই। একথা এ বাড়ীর ঐ আঁটকুড়ীরা সবাই জানে। ঐ ত পারুলের মা-ই, তার অত সাধের বেনারসীখানা মাত্র কুড়ী টাকায় কিনিয়া স্বচ্ছন্দে উহার কোন্ ননদকে ষাট টাকায় বেচিয়া দিল। তিনি সেখানা লইয়া যাইবার সময় বেশ সহজভাবেই বলিয়া গেলেন 'এ বেনারসীর আগে যে দামই থাক এখন আড়াই শ' টাকার কমে নতুন কেনা যাবে না।' বেচারী নলিনী বাজারের দর জানে না, তাহার যাচাই করিবার লোক নাই বলিয়াই না তুমি

অমন করিয়া ঠকাইলে। তাও তিনদিনে চল্লিশ টাকা লাভ করিয়া কি পারুলের মা দশটি টাকা দিতে পারিত না! আজ সে-ই বলে নলিনীকে চোর, সকলকে বলে সাবধান থাকিতে। হায় রে!

নন্দরাণী কমসে কম তাহার তিনখানি শাড়ী কিনিয়াছে বোধ হয় সিকি মূল্যেরও কমে। তখন ত কত সহানুভূতি—'তাই তো বোন, কি করবে বল, সবই অদৃষ্ট। এখন ঐ গুঁড়োটুকুকে মানুষ করে তোল যেমন করেই হোক—তবে যদি একদিন আবার দাঁড়াতে পারো। এখন এমনি করেই দিন গুজরাণ করতে হবে। উপায় কি?' এমনি কত মিষ্ট কথা। এখন সে নলিনীর ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না। উপকার কি কিছুই হয় নাই নলিনীর দ্বারা? ঐ কাপড়গুলি এখন কিনিয়া দিতে হইলে নন্দরাণীর বরকে ত দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইতে হইত।

তা হোক—তা বলিয়া নলিনীর যে কোন অন্যায় নাই এমন কথা সে বলিতে চায় না কিন্তু কিই-বা করিতে পারে সে?

তাহার স্বামী তারাদাস কোন এক বইয়ের দোকানে চল্লিশ টাকা মাহিনায় চাকরী করে। তাহার বিদ্যাবুদ্ধি কম, মুরব্বির জোর ছিল না সুতরাং অন্য কোন অফিসে ঢোকা সম্ভব হয় নাই। তবু বাঙ্গালীর ব্যবসায় বিশেষতঃ বইয়ের দোকানে চল্লিশ টাকা মাহিনা কম নয়—কাজের লোককেই এই মাহিনা দেওয়া হয়। নলিনীর যখন বিবাহ হয় তখন সে পাইত ত্রিশ টাকা। এতদিনে বাড়িয়া চল্লিশ হইয়াছে। ঐ মাহিনা আর দৈনিক দুআনা জলপানি। তাহাতেই এতদিন একরকম করিয়া চলিয়াছে। তারাদাসের এক মামী ছিলেন কলিকাতাতেই, তাঁহার হাতে দুই-এক পয়সা ছিল। নলিনীর কাপড়

জামা অন্য সৌখীন জিনিষ যা-কিছু তিনিই মধ্যে মধ্যে কিনিয়া দিতেন। উহাদের দুইটি প্রাণীর সংসার এক রকম করিয়া যাইত তাঁরাদাসের আয়ে। বিলাস হয়ত চলিত না—প্রাণ ধারণ চলিত। তারপর মামী হঠাৎ তীর্থ করিতে গিয়া মারা গেলেন তাঁহার কাছে যা কিছু ছিল সব তাঁহার ভাসুর-পোরা গ্রাস করিয়া বসিল, তারাদাস কুটাটি পর্য্যন্ত পাইল না। তবু তাহাতেও দুঃখ ছিল না, সংসারটা চলিলেই সে সুখী, কোনমতে তাহার ছেলেটা মানুষ হইলে হয়। ভগবান একদিকে তাহাকে বাঁচাইয়াছেন, এক পাল ছেলেপুলে দেন নাই। স্বামী স্ত্রী আর ঐ ছোট ছেলেটি, আড়াইটি প্রাণীর সংসার। এক রকম করিয়া চলিয়াই যাইত। আট টাকা ঘর ভাড়া লাগিত—ঐটাই যা বেশী। বাকী সব জিনিষেরই ত দাম কম ছিল, অসুবিধা হইত না এমন কিছুই।

তারপর কোথা হইতে এই পোড়া যুদ্ধ বাধিল, বাজারে লাগিল আগুন—কোন জিনিষেই হাত দেওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে আসিল মন্বন্তর। তারাদাসের যা আয় তাহাতে এক সপ্তাহ চলে না। এ বাড়ীর অন্য যে সব বাবুরা অফিসে কাজ করেন তাহাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু মাহিনা বাড়িল, মাগ্‌গি ভাতার ব্যবস্থা হইল—অফিস হইতে চাল ডাল দিবারও ব্যবস্থা হইল কিন্তু তারাদাসের সেসব নাই। মাগ্‌গি ভাতা ত নয়ই—মাহিনা বাড়িল তিনটি টাকা। সেও মন্বন্তর প্রায় পার করিয়া। উপরি বলিয়া কিছু উহাদের নাই বছরের মধ্যে একবার পূজার সময় দু পাঁচ টাকা করিয়া বখশিষ জড়ো হয়, কোন বছর পঁচিশ কোন বছর আটাশ, কোন বছর পঁচিশেরও কম। তাই সাতজন কর্ম্মচারীতে ভাগ হইয়া সাড়ে তিন টাকা মাথা পিছু দাঁড়ায়। কর্ত্তারা দেন শীতকালে পনের দিনের

মাহিনা বোনাস্—আর এক কাপ চা ও একটা টোস্ট অতিরিক্ত। তাও নাকি অন্য দোকানে নাই, তাঁহারা বিশেষ সুবিধা দেন। সুবিধা তো কত! মনে মনে বলে নলিনী, রাত দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত খাটাইয়া লন পূরা দুইটি মাস, তাহার বদলে পনেরো দিনের মাহিনা বোনাস? অমন অনুগ্রহের মুখে আগুন।

সেই মন্বন্তরের হিড়িকেই নলিনী সর্ব্বস্বান্ত হইল। গহনা যা দুই এক কুঁচি ছিল তা গেল, ভাল কাপড় সব বিক্রি করিয়া দিল—যে দুই একটা সখের জিনিষ প্রাণ থাকিতে হাত ছাড়া করিবে না প্রতিজ্ঞা ছিল, তাও বেচিতে হইল। তখন মনে হইয়াছিল মন্বন্তরটা কাটিয়া গেলে হয় কোন মতে, তারপর আবার জীবন চলিবে সহজে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কাটিল, সরকার চাল আটা রেশন করিয়া দিলেন—তেমনি অন্য সব জিনিষের দাম দিন দিন আরও বাড়িতে সুরু করিল। কাপড় ত পাওয়াই যায় না। যে করিয়া নলিনী লজ্জা নিবারণ করে তা সেই জানে। তারাদাসকে বাহিরে যাইতে হয়, তাহার জন্যই দুর্ভাবনাটা বেশী। বাজারে যাওয়াই প্রায় বন্ধ করিতে হইয়াছে, মাছ খায় নাই তাহারা কতকাল তা মনেও পড়ে না আর। এক বোতল কেরোসিন তেল দশ আনার কম মেলে না। কণ্ট্রোলের দোকানে নাকি সস্তায় পাওয়া যায় কিন্তু কে দাঁড়ায় সেখানে দৈনিক তিন-চার ঘণ্টা? আলো· অবশ্য নলিনী বেশী জ্বালে না, তবে যেটুকু প্রয়োজন, অন্তত খাওয়া দাওয়ার সময় ত একবার জ্বালিতে হইবে! কয়লা তাও মধ্যে মধ্যে তিন চার টাকা মন হয়।

সুতরাং দিন আর এখন কাটে না। টাকা যে কয়টি পায় তারাদাস মাসের পনেরো দিনও তাহাতে কাটিবার কথা নয়। বাকী দিন কাটে

কি করিয়া? সে দুই বেলা খাওয়া বহুকালই ছাড়িয়া দিয়াছে কিন্তু যে লোকটা উদয়াস্ত খাটে তাহার দুই বেলা দুই মুঠা বাদ দিলে কি চলে, তা ছাড়া ঐ বাচ্ছাটা, একদম ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না। জল খাবার বন্ধ হইয়াছে কিন্তু ভাত না দিলে অত্যন্ত কাঁদে। যেমন করিয়াই হউক, হাঁড়িতে দুই এক মুঠা ফেলিয়া রাখিতে হয়। বইয়ের দোকানের বহু কর্ম্মচারীই নাকি চাদরের মধ্য করিয়া নয়ত জামার মধ্যে পুরিয়া বই চুরি করে—রীতিমত একটা চোরাই মালের কারবারই আছে। কিন্তু তারাদাস অত্যন্ত ভীতু, সে কিছুতেই সাহস পায় না। পুরুষ যদি পুরুষের কর্ত্তব্য না করিতে পারে তাহা হইলে স্ত্রীলোককে বাধ্য হইয়া লাগিতে হয়। আহার সংস্থান করা পুরুষের কাজ—তারাদাস পারে না বলিয়াই নলিনীকে আজ উঞ্ছবৃত্তি করিতে হয় স্বামী পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য।

তা-ও, কী এমন চুরি করে সে? ফাঁক পাইলে কাহারও কাহারও ঘর হইতে আলুটা কাঁচকলাটা লইয়া আসে, এইত! চাল এক আধ মুঠা যে না লইয়াছে তা নয় কিন্তু সে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই। সন্তানের অনাহারে থাকিবার সম্ভাবনা যেখানে সেইখানেই শুধু এ কাজ করিয়াছে সে। নহিলে অন্ন স্ত্রীলোককে চুরি করিতে নাই তাহা সেও জানে। পয়সা? হাঁ, পয়সাও সে সরাইয়াছে কিন্তু সেও এমনি জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত হইলেই। শুধু শুধু চুরি অভ্যাস বলিয়া কখনও চুরি করে নাই সে। এমন অনেক দিন হইয়াছে যেখানে সে এক বা ততোধিক টাকা চুরি করিতে পারিত অনায়াসে—সেখান হইতেও একটা আনির বেশী লয় নাই। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর বেশী সে পাঁকে নামিতে চায় না কোন দিন।

অথচ তাহাতেই এত কাণ্ড।' পারুলের মায়ের ঘর হইতে আজ পর্য্যন্ত সে যাহা কিছু লইয়াছে সবটার দাম ধরিলেও বোধহয় তিন চার টাকার বেশী হইবে না। সেকি এতই বেশী?

চুরিতে যে পয়সা উহাদের ঘরে আসে হিসাব করিলে যায় ত তাহার শতাংশেরও কম। এটুকুও মানুষকে ছাড়িয়া দিতে অত আপত্তি! 'উহারা এমন শুরু করিয়াছে যেন সে দাগী চোর কিংবা ডাকাত।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, যাহার ঘর হইতে সে বোধহয় সব চেয়ে বেশী লইয়াছে, সে-ই অনুপমা কোনদিন একটা কথা বলে নাই। ইহাদের দল-পাকানো আক্রমণে অংশ ত লয়ই না—ইসারা-ইঙ্গিতেও কোন কথা প্রকাশ করে না। অথচ এমন ভাবেই তাহার ঘরে সব জিনিষ ছড়ানো থাকে যে আজকাল এক এক দিন নলিনীর সন্দেহ হয় যে সে ইচ্ছা করিয়াই সব এমনি মেলিয়া রাখে, হয় ত বা নলিনীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, চুরীর সুযোগ দিবে বলিয়াই।

'অনুপমার স্বামী ধনী নয়, কি একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে—ছেলেপুলে হয় নাই বলিয়াই কোনমতে স্বচ্ছলে দিন যায়। তবু তাহার যেটুকু বুকের পাটা আছে—বাড়ীতে কাহারও তা নাই। কথাত সবাই ছাড়িয়াই দিয়াছে এক নীলিমা যা দু একটা কথা বলে, আর অনুপমা। বাস্তবিক যাহার ভাল হয় তাহার সব ভাল হয়। অনুপমার মিষ্ট কথা শুনিলেও গা জুড়াইয়া যায়।

অনুপমার কথা মনে হইতেই নলিনী অনেকটা শান্ত হইল। ঘরের বিস্তর কাজ পড়িয়া আছে। এক হাতেই সব যখন করিতে

হইবে তখন বসিয়া লাভ নাই।' রেশনের চাল একটি একটি করিয়া বাছিয়া লইতে হয়, নহিলে দাঁত পাতা যায় না এমনি কাঁকর—মুখ-পোড়ারা ইচ্ছা করিয়া মিশাইয়া দেয় নাকি ? .

সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ঘরের দিকে চাহিতেই প্রথমে তাহার যেটা নজরে পড়িল সেটা একখানা দুই টাকার নোট, ভাঁজ করা অবস্থায় তক্তাপোষের নীচে পড়িয়া আছে !

প্রথমটা তাহার বিশ্বাস হইল না। এমন কি হাত দিয়া তুলিয়া দেখিতেও যেন কেমন একটা সংকোচ আসে। ঘরে কেহ নাই, তবু ভয় হয় বুঝি ওটাকে টাকা বলিয়া মনে করার জন্য সবই হাসিয়া উঠিবে। এমনি করিয়া সংশয় ও বিশ্বাসে দুলিতে দুলিতে বস্তুটা হাতে করিয়া তুলিয়া লইবার পর আর কোন সন্দেহ রহিল না। দুই টাকার নোটই বটে—নূতন করকরে নোট।

কিন্তু এখানে টাকা কোথা হইতে আসিল ? তারাদাসের পকেট হইতে পড়িয়া যাইবে বা সে-ই মনের ভুলে ফেলিয়া রাখিবে এমন কোন সম্ভাবনা নাই—কারণ আজ বাড়ীতে এমন এক আনা পয়সাও ছিল না যাহাতে সে একটু ডাল আনায় বা কোন আনাজ কেনে। আজ স্রেফ নুন আর ফ্যান্ মাখিয়া ভাত খাইয়া গেছে খোকা। একটি মুখি কচু পড়িয়া ছিল সেইটি ভাতে দিয়া ভাত দিয়াছে স্বামীকে। তারাদাস ভাত খাইতে খাইতে দুইবার চোখ মুছিয়াছে। ...খোকা খুব শান্ত, তবু আজ সে মাকে প্রশ্ন করিয়াছে, 'কিছু একটা করোনি মা ? একটু ডাল ভাতেও দাওনি ?' আজ কোথাও হইতে কিছু পাইবারও সম্ভাবনা নাই। তারাদাসের অফিসে কেহ

আর তাকে ধার দেয় না। অর্থাৎ যতগুলি ধার দিবার মত লোক ছিল সকলকার কাছ হইতেই সে কিছু কিছু লইয়াছে। বিকালে আবার কি করিয়া খোকার মুখে শুধু ভাত ধরিয়া দিবে তাই দুর্ভাবনা। কতকটা সেই উদ্দেশ্যেই সে উপরে উঠিয়াছিল—দুপুর বেলার অসতর্কতায় অনেক সুযোগ মেলে একথা সত্য। কিন্তু এমন ভাবে পারুলের মা চেঁচামেচি করিল যে আর কোন ঘরের দিকে চাহিতেই সাহসে কুলায় নাই তার।

তবে ?

এটাকা কোথা হইতে কী করিয়া আসিল ? কোন কবি-প্রকৃতির লোক হইলে ইহাকে অনায়াসে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিতে পারিত কিন্তু কঠোর দুঃখের মধ্যে দিন কাটাইয়া নলিনী এটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাদ ফুঁড়িয়া এমন ভাবে আসে না। এ টাকা কে এখানে ফেলিল ? তাহার ঘরে টাকাটা ফেলিয়া পরে তাহাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করে নাই ত কেহ ?

ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া নলিনী বহুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি করিবে, নোটটা পুড়াইয়া ফেলিবে কিংবা পাশের জানালা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিবে ? নোট খানা উল্টাইয়া দেখিল কোথাও নাম টাম লেখা নাই—কিন্তু অন্য কোন চিহ্ন যদি দেওয়া থাকে যা তাহার নজরে পড়িল না ?…

অনেকক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর অকস্মাৎ নলিনীর কথাটা মনে পড়িয়া গেল। ঠিক ত! সে যখন উপরে ওঠে তখন অনুপমা তাহার ঘরে ছিল না—দরজাও ছিল বাহির হইতে বন্ধ।

একেবারে একতলায় নামিবার পথে অনুপমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল বটে কিন্তু তখন নলিনীরও ঠিক কথা কহিবার মত মনের অবস্থা ছিল না—অনুপমাও তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া উঠিয়া গিয়াছিল। নীচে আসিয়াছিল সে কার কাছে? পারুলের মায়ের সঙ্গে ত তাহার সে রকম সদ্ভাব নাই—এমন কি কথাবার্ত্তাও চলে না ভাল করিয়া। তবে? তবে কি সে নলিনীর ঘরেই—?

কথাটা যতই ভাবিতে লাগিল ততই সে মনে মনে নিঃসন্দেহ হইল। এ নিশ্চয়ই অনুপমার কাজ। হয়ত কোনক্রমে আজিকার দুরাবস্থার কথাটা সে জানিতে পারিয়াছে—এবং তাহার ছাদে যাইবার সুযোগ লইয়া নিঃশব্দে টাকাটা ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। সকলেই তখন তাহাদের নিজের ঘর লইয়া ব্যস্ত। নলিনীর ঘরে কে উঁকি মারিল সেদিকে কাহারও চোখ ছিল না।

পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল নলিনী। এ ভিক্ষা বটে, কিন্তু কতখানি সহানুভূতি ও সঙ্কোচের সঙ্গে এ ভিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—কতখানি লজ্জা ও অসম্ভ্রমের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য, সে কথা মনে করিয়া সে অপমান বোধ করিতে পারিল না বরং সে যে একটা বৃহত্তর অপমানের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, এই কথাটাই বারবার তাহার মনে হইতে লাগিল।

আরও অনেকক্ষণ এমনি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার পর কী যেন একটা অব্যক্ত বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল নলিনী। ঘর দুয়ার সব পড়িয়াই রহিল, সে একেবারে দোতালায় উঠিয়া সোজা অনুপমার ঘরে উপস্থিত হইল।

কোলাহল

অনুপমা তখন শুইয়া কী একটা বই পড়িতেছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'এসো নলিনী দি—'

কে জানে কেন, সে যেন কিছুতেই নলিনীর মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না। দৃষ্টি নত করিয়াই বসিয়া বসিয়া একটা চুড়ি খুঁটিতে লাগিল!

নলিনীও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল চুপ করিয়া, তাহার পর অকস্মাৎ এক সময়ে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, 'কেন তুমি আমাকে এত দয়া করো ভাই, আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি।…পাছে আমি মনে দুঃখ পাই তাই তুমি লুকিয়ে ভিক্ষে দিয়ে এলে—সে-ই তোমার ঘর থেকেই কতদিন আমি চুরি করেছি অনুপমা। এ ঘেন্না আমি কেমন করে ভুলব! ওরা কিছু মিথ্যে বলেনা ভাই, আমি চোর, চুরি করেই খেতে হয় আমাকে কিন্তু তোমার ঘরেও চুরি করেছি, এ লজ্জা যে, আমি সইতে পারছি না কিছুতে!'

সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

কারণ

সেদিন ঘোষাল বাড়ীতে একটা অঘটন ঘটে গেল। সাধারণত সে সব বাপ-মা কখনও ছেলেকে শাসন করেন না, তাঁরা কোন কারণে নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলে হঠাৎ শাসনটা এমনি গুরুতরই হয়। নইলে যে বিমলের মাথা ধরলে তার বাবা চোখে অন্ধকার দেখেন, সেই বিমলকেই তিনি বেতের বাড়ি অত মারলেন কি ক'রে! আর কারণটা নিতান্তই তুচ্ছ। গোপালকে বিমল

মেরেছে—এ ঘটনাটা এতই সাধারণ এবং—অন্তত এবাড়ীর লোকের কাছে, এত স্বাভাবিক যে তা নিয়ে এত কাণ্ড করার কি আছে তা কেউ ভেবেই পেলে না!

ব্যাপারটা আর কিছুই না। গোপালকে এ বাড়ীর কোন লোক কোন দিনই কাজের সময় পায় না, কেউ তাকে ডাকেও না। সে সম্পূর্ণরূপে বিমলেরই চাকর, আর সত্যি কথা বলতে কি, ওর ফরমাস খেটেই সে দিনেরাতে এক মিনিট ফুরসুৎ পায় না। নিতান্ত সেদিন কর্ত্তা নিজে গোপালকে ডেকে তামাক সাজতে বলেছিলেন বলেই সে তাঁর সামনে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অনেকক্ষণ থেকেই তিনি তামাক চাইছিলেন কিন্তু কারুর সাড়া পান নি—দূর দিয়ে গোপালকে চলে যেতে দেখে হঠাৎ তাকেই ডেকে হুকুম করেন তামাক আনতে। কল্‌কেতে ক'রে তামাক সেজে এনে যেমন সে হেঁট হ'য়ে তাঁর গুড়গুড়িতে পরাতে যা'বে ওর পিঠের দিকে পড়ল হরিপদবাবুর নজর—বলে উঠলেন, 'ও কি, তোর পিঠে ও কিসের অমন দাগ?'

নিকষ কালো রং—চকচকে কালো, তবু তারই মধ্যে লম্বা লম্বা দাগগুলি শোণিতাক্ত হয়ে উঠেছে বেশ বোঝা যায়।

গোপাল অপ্রতিভ হয়ে কোনমতে পালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হরিপদবাবু ততক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছেন, 'ওকি রে—পালাচ্ছিস কেন? কি হয়েছিল বললি না?'

তবু গোপাল বলতে পারে না। সে ইতস্তত করছে দেখে বলে দিলে হরিপদবাবুর ছোট মেয়ে বেণুই—'দাদা ওকে হাণ্টারের বাড়ি মেরেছে বাবা।'

'কে মেরেছে? বিমল?' হরিপদবাবু চমকে উঠলেন। 'ঐ রকম ক'রে মেরেছে ওকে?'

বেণুর বয়স অল্প হ'লেও এ বাড়ীতে একমাত্র সে-ই বিমলকে ভয় করে কম। কারণ সে হ'ল হরিপদ বাবুর আদরের শেষ সন্তান। সে বললে, 'দাদা ত প্রায়ই মারে—একটু কিছু পান থেকে চুন খসলেই ওকে ধরে ঠ্যাঙায়।'

'তা ব'লে ঐ রকম ক'রে মারবে!' হরিপদবাবুর চোখ জ্বলে উঠল—'এ যে দস্তুর-মত বর্ব্বরতা!'

তারপর গোপালকে প্রশ্ন করলেন, 'কি করেছিলি তুই?'

অগত্যা গোপালকে বলতে হ'ল, 'একটা চিঠি—ফেলতে দিয়েছিলেন, ফেলিনি তাই।'

হরিপদবাবুর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কঠিন শোনাল। বেণুকে ডেকে বললেন, 'তোর দাদাকে ডেকে আন্,' আর গোপালকে বললেন, 'তুই কাজে যা!'

তবু হয়ত বিমল বেঁচেই যেত কিন্তু হঠাৎ সে বাবার মুখের ওপরই অত্যন্ত উদ্ধত জবাব দিয়ে ফেললে, দুষ্টু ঘোড়ার মত ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, 'বেশ করেছি—আমার চাকর আমি যা খুশি করব!'

হরিপদবাবুর দৃষ্টি আরও কঠোর হয়ে উঠল। তিনি শুধু বললেন, 'তোমাকে ওর কাছে মাপ চাইতে হবে!'

বিমল জবাব দিলে, 'আমি পারব না।'

তারপরই ঐ অঘটন ঘটে গেল। বেত যে হরিপদবাবুর হাতের কাছেই ছিল তা কেউ জানত না। বিমলের মা কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন, বাড়ীসুদ্ধ লোক ছুটে এল কিন্তু হরিপদবাবুর মুখের চেহারা

দেখে কেউ কাছে যেতে সাহস পেলে না। বিমলও তেমনি ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, পিঠের গেঞ্জি রক্তে ভিজে উঠ্‌ল তবু সে মাথা নোওয়ালে না। মিনিট কতক পরে মায়ের কান্নাতেই বোধ হয় নরম হ'ল—বললে, 'বেশ, আমি মাপ চাইব!'

হরিপদবাবু হাতের বেত ফেলে বললেন, 'ওরে, গোপালকে ডাক্‌!'

অথচ গোপাল যখন প্রথম এল এ বাড়ীতে চাকরীর খোঁজে—তখন এঁরা কেউ রাখতে চাননি। বেণু তখন শিশু, তাকে ধরবার জন্য লোক দরকারও ছিল কিন্তু গিন্নী বললেন, 'বাপ্‌রে, ও যা কালো, মেয়ে আমার মরে যাবে ভয়েই!'

ষোল্‌ সতের বছর বয়স হবে বোধ হয়, এম্‌নি মুখের চেহারা খারাপ নয়—বরং ভালোই, কিন্তু রং সত্যিই কুচ্‌কুচে কালো—একেবারে বার্ণিশ করা কালো। তার মধ্যে থেকে সাদা ঝক্‌ঝকে মুক্তোর মত দাঁত বার ক'রে হাস্‌লে আবছা আলোয় অচেনা মানুষের ভয় করবারই কথা।

সুতরাং—গিন্নীর কথায় সুর টেনেই বুড়ো চাকর হারাধন বলে উঠল, 'না হে ছোক্‌রা, চাকর টাকর রাখা হবে না, তুমি যাও। বলা নেই, কওয়া নেই—এরা একেবারে ছুট্‌ ভেতরে কেন চলে আসে বুঝি না!···যাও, যাও—'

শুক্‌নো মুখে গোপাল বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ বিমলই ডাকলে, 'এই যেওনা দাঁড়াও,'—তারপর বাবার দিকে ফিরে বললে, 'আমি ওকে রাখব বাবা—ও থাকুক।'

আদুরে ছেলের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হরিপদবাবু বললেন, 'কী করবি রে ওকে নিয়ে?'

আব্‌দারের স্বরে বিমল বললে, 'ও আমার চাকর হবে বাবা!'

'আচ্ছা, থাক্ তবে। ওহে হারাধন, একটু খোঁজ খবর নিয়ে ওর একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

হারাধন একটু প্রতিবাদের স্বরে বললে, 'এতগুলো লোক রয়েছি বাবু, দাদাবাবুর ফায়-ফরমাস্ খাটার কি লোকের অভাব হ'ত?'

কিন্তু তার কথা টিক্‌ল না, বিমল এক ধমক দিয়ে উঠল, 'যা বলছি তাই শোন গে। আমার খুশী, ও থাক্‌বে।'

বলাবাহুল্য এর পর আর কোন কথাই ওঠেনি। গোপাল সেই মুহূর্ত্ত থেকেই বাহাল হয়ে গেল, এবং বিমল তাকে সম্পূর্ণরূপেই দখল ক'রে বসল। বিমলের বয়স তখন বছর তেরো, ফুটফুটে স্বাস্থ্যবান ছেলেটি—গোপাল তার এই ক্ষুদ্র মনিবকে দেখে অবাক্ হয়ে গেল। এম্‌নি চাকরী করত হয়ত মাইনের জন্য কিন্তু বিমলের ফরমাশ খাটায় তার যেন কোথায় একটু আনন্দও আছে। সে ওর তুচ্ছ খেয়াল মেটাতেও ছোটে ঝড়ের আগে। জানে যে, একটা কাজ ক'রে এসে দাঁড়ালেই আর একটা কাজের হুকুম হবে—তবু ও পথে কোথাও দেরী করে না, কোন কাজেই ওর আলস্য নেই। যেটুকু বিশ্রাম সহজে নেওয়া যায়, সেটুকুও সে নিতে চায় না।

বিমলও তার এই অনুরক্ত ভৃত্যটির ওপর খুশী ছিল, কারণ সমবয়সী বলতে এ বাড়ীতে তার কেউ ছিল না, বন্ধু হিসাবেও কতকটা কাজে লেগেছিল গোপাল। জমিদারের ছেলে বাড়ীর বাইরে গিয়ে সাধারণ পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করবে, এ কল্পনাও ছিল হরিপদ-

বাবুর কাছে অসহ্য। ছেলেকে যত আদরই দিন তিনি—আসলে ছিল সে বন্দী। খাঁচা সোনার হ'লেও পাখীর হাঁফ্ ধরে বৈকি! সেই সাধটা বিমলের মিটে ছিল এই চাকরটিকে দিয়ে। ওর ঘুঁড়ি ওড়ানো, ওর গুলি খেলা, গাছে ওঠা প্রভৃতি ব্যসনে গোপাল ছিল আদর্শ সহচর। আর সবচেয়ে যেটা ভাল লাগ্‌ত বিমলের—মার খেতে ওর বোধ হয় জুড়ি ছিল না। অন্য চাকর দু-একজনের ওপর যে সে পরীক্ষা ক'রে দেখতে যায়নি তা নয় কিন্তু সে দিকে বিশেষ সুবিধা হয়নি, তারা বাবা-মাকে তৎক্ষণাৎ বলে দেয়, ফলে বকুনি খেতে হয় বিমলকেই। কিন্তু এ বিষয়ে গোপাল ছিল আদর্শ—কীল-চড়-ঘুষি-লাথি থেকে সুরু ক'রে বেত, যায় লাঠি পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যেত না। কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করা ত দূরের কথা—কোন দিন তার জন্য ওর চোখে জল কেউ দেখেনি। চোরের মার সে হজম করত হাসিমুখে—মনে হ'ত যে মার খেতে যেন ওর ভালই লাগে।...দু'একদিন হয়ত মার চোখে প'ড়েছে ওর গায়ের কালসিটে—ও-ই কথাটা ঢেকে নিয়েছে পাঁচটা মিথ্যা কথা ব'লে, পাছে বিমল বকুনি খায়।

এমনি করেই দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটেছে। প্রথমে গোপালের শোবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল নীচে—চাকরদের ঘরে, তা থেকে বিমলের চেষ্টাতে সেটা উঠেছিল মনিবেরই শোবার ঘরে—কে জানে, রাত্রেই যদি বিমলের কিছু দরকার হয়। বিমলের খাটের পাশে, প্রত্যহ রাত্রে ছোট্ট একটি বিছানা পড়ত গোপালের, কিন্তু অর্দ্ধেক দিনই তার সে বিছানায় শোওয়া হয়ে উঠ্‌ত না। রাত্রে [illegible]

আগে বিমল বিছানায় শুয়ে বই পড়ত আর গোপাল দিত ওর পায়ে হাত বুলিয়ে। কোন কোন দিন ওর ওপর বিরক্ত হবার কারণ ঘটলে বিমল বলত, 'যা গোপাল তুই শুগে যা—'নইলে বইটি রেখে ওর হাত ধরে ওকে টেনে নিত নিজের কাছে, এবং ওর সেই নিকষ কালো দেহ জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ত এক নিমেষে। বলা বাহুল্য, এ সংবাদ হরিপদ বাবু রাখতেন না, তাঁর কানে এ কথা গেলে গোপালের হয়ত চাকরীই যেত—কারণ আভিজাত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল খুব প্রখর। বিমলও এ কথাটা জানত বলেই ব্যাপারটা রাখত গোপনে। গোপালকে সে মারতও যেমন, ভালও বাসত—সে সাধারণ চাকরদের সঙ্গে নীচের ঘরে শোবে, একথা এখন আর বিমল কল্পনাও করতে পারত না। এমন কি ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলেজে ঢোকার পরও সে চাকরের গলা জড়িয়ে ঘুমোনোকে লজ্জাকর ব'লে মনে করেনি।

কিন্তু হঠাৎ গোপালের অপরিসীম প্রভুভক্তি কি জানি কেন কিছু টলেছে। ওর সেই অবিচলিত বশ্যতার মূলে যেন কে একটা প্রকাণ্ড নাড়া দিয়েছে। অথচ কেন যে এই পরিবর্ত্তন—বিমল হাজার চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না।

হরিপদবাবুর সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও ছেলেকে তিনি একালের হাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। ইস্কুল-কলেজের বন্ধুদের প্রভাব, উপন্যাস পড়া ও সিনেমা দেখা—এই তিনটের বিষম বিষক্রিয়া হ'ল ওর মধ্যে। যে ছেলে সাধারণভাবে 'মানুষ হয়, তার তবু কতকটা টিকে নেবার কাজ হয়ে থাকে কিন্তু যে ছেলেকে বাপ-মা বাইরের ছোঁয়াচ থেকে দূরে রাখেন তাদের সর্ব্বনাশ হ'তে দেরী হয় না। বিমলও আঠার বছর পূর্ণ হবার আগেই "ওদের পাশের বাড়ীর মেয়ে

পারুলের প্রেমে পড়ে গেল। মেয়েটি দেখতে এমন কিছু ভাল নয়, শুনতে অর্থাৎ গুণের দিক থেকে ত নয়ই। কিন্তু সে-ই একমাত্র কুমারী মেয়ে যে, এ বাড়ীতে আসতে পেত। পারুল বোধ করি বিমলেরই সমবয়সী হবে, যদিও দেখায় কম। অত্যন্ত প্রগল্‌ভা মেয়ে (গোপালের মতে 'বেহায়া')—বিমলের মা তাকে মোটেই প্রীতির চোখে দেখতেন না। তাই আসা যাওয়া থাকলেও, সেটা ছিল খুব কম।

অবশ্য তাতে বিমলের অনুরাগ বাধা পায় নি। কিন্তু এক্ষেত্রে যাকে তার সবচেয়ে দরকার সেই গোপাল হঠাৎ বিগ্‌ড়ে বসল। সে এ ব্যাপারে কিছুতেই কোন সাহায্য করতে রাজী নয়—এমন কি, সে ভয়ও দেখায় যে, বিমল এ সব ছেড়ে না দিলে সে স্বয়ং হরিপদ বাবুকে ব্যাপারটা জানাবে!

এ নিয়ে বিমল অনেক চেষ্টা করেছে। ইদানীং গোপালকে বিশেষ মার-ধোর করত না সত্য কথা—প্রথমে মিষ্টি করেই বুঝিয়ে দলে টানবার চেষ্টা করেছে, তোষামদে যখন কাজ হয়নি তখন রাগ করেছে, মার-ধোরও করেছে কিন্তু গোপাল অটল।

তবু তাতেও বোধ হয় বিমলের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌ত না—যদি গোপাল বিশ্বাসঘাতকতা না করত। হঠাৎ গোপাল কি কারণে কয়েক দিন হ'ল বশ্যতা-স্বীকারের ভাব দেখায়। ফলে বিমল তার হাত দিয়ে পারুলকে খান-তিনেক চিঠি পর পর পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে উত্তরের আশা করছিল, এবং উত্তর না পেয়ে মনে মনে চট্‌ছিল পারুলের ওপরই। তারপরেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল—পারুল তাদের ছাদ থেকে ইঙ্গিতে বিমলকে জানিয়ে দিলে যে সে কোন চিঠিই পায়নি।

বিমল মুখ অন্ধকার ক'রে গোপালের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করলে। গোপাল সরল ভাবেই স্বীকার করলে যে চিঠি সে ছিঁড়ে ফেলেছে, ইচ্ছে করেই পারুলকে দেয়নি।

বিমল রেগে আগুন হয়ে প্রশ্ন করলে, 'তার মানে?'

গোপাল বললে, 'আমি জেনে শুনে তোমার অনিষ্ট করতে পারব না দাদাবাবু, কেটে ফেললেও নয়!'

তারপর বিমলের পা ধরে বলতে গেল, 'তোমার পায়ে পড়ছি দাদাবাবু—এ সব ছাড়, ওতে তোমার ভাল হ'তে পারে না। বাবু জানতে পারলে অনর্থ করবেন, তা ছাড়া মেয়েটাও ভাল নয়—'

বিশ্বাসঘাতকতা যদি-বা সয়েছিল, উপদেশ সইল না—বিমলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্‌ল। হান্টারটা টেনে নিয়ে অনেকদিন পরে পাগলের মত মারতে লাগল। গোপাল একটা প্রতিবাদ করল না, এমন কি পালিয়ে গিয়েও আত্মরক্ষার চেষ্টা করল না, নিঃশব্দে মার খেয়ে ও জানিয়ে দিলে যে মার খাওয়া বরং সহজ, কিন্তু এ ব্যাপারে সহযোগিতা করা ওর পক্ষে অসম্ভব। বিমলের তখন জ্ঞান ছিল না, এতটা বাড়াবাড়ি না করলে হয়ত ধরাও পড়ত না—কিন্তু পিঠে রক্তের দাগ নিয়ে যখন গোপাল চুপ ক'রেই বেরিয়ে চলে গেল তখন ওর অনুশোচনার সীমা রইল না। এই দীর্ঘ দিনের সাহচর্য্যে গোপালের প্রতি ওর স্নেহটা হয়ে উঠেছিল সত্য—আন্তরিক ত বটেই। হরিপদ বাবুর কাছে দাঁড়িয়ে মার খাওয়ার মধ্যে বোধ হয় ওর মনে একটা প্রায়শ্চিত্তের কথাও ছিল।

ঘটনাটা নিয়ে অনেক হৈ চৈ-হ'ল বাড়ীতে। অনেকেরই মতে এটা হরিপদবাবুর বাড়াবাড়ি! সে যাই হোক, গোপালের প্রতিষ্ঠা যে বিমলের কাছে চিরকালের মতই নষ্ট হ'ল সে সম্বন্ধে চাকরদের কারুরই বিন্দুমাত্র সংশয় রইল না।

ভয় গোপালেরও হয়েছিল কিন্তু সে বিমলের রাগের জন্য নয়, তার প্রীতি নষ্ট হয়ে যাবার জন্যও নয়—বিমলের ঠিক কতটা লাগল সেই আশঙ্কাই ওর মনে সব চেয়ে প্রবল হয়ে উঠল। এর চেয়ে আরও সহস্রবার তার নিজের মার খাওয়া ভাল ছিল। এ যন্ত্রণা কারুর কাছে জানাবার নয়—বলবার নয়। পিঠের জ্বালা তখন ওর আর বিন্দুমাত্র ছিল না—ওর মন তখন আকুলি-বিকুলি করেছে বিমলের জন্য। ঐ ননীর মত শুভ্রকোমল দেহে প্রতিটি বেতের ঘা যেন তার মনেই কেটে কেটে বসছিল। হরিপদবাবু যখন বিমলের ক্ষমা-প্রার্থনার জন্য তাকে ডেকে পাঠালেন তখন একবার তার দিকে চেয়ে ও আর চোখের জল সামলাতে পারলে না। বিমলের বক্তব্য শেষ হবার আগেই হরিপদবাবুর বিরক্তির ভয়ও অগ্রাহ্য ক'রে কাঁদতে কাঁদতে একরকম ছুটেই পালিয়ে গেল।

বিমলও একথা জানত! সে জানত যে এই বেতের আঘাত তার চেয়ে শতগুণে বেশী বাজবে গোপালের—তাই অভিমানটা ওর গোপালের প্রতি এই ঘটনার জন্য কিছুমাত্র ছিল না, ছিল সেই আদিম কারণেই, অর্থাৎ তার অসহযোগিতার জন্য!

গোপাল সারাদিন বিমলের কাছে এল না, বিমলও ওকে ডাকলে না—একেবারে খাওয়া দাওয়ার পর প্রভু-ভৃত্যে সাক্ষাৎ হ'ল। দোর বন্ধ ক'রে গোপাল যখন মাথা হেঁট ক'রে কাছে এসে দাঁড়াল তখন

বিমল চেয়ারে বসে বই পড়ছে। ও কাছে আসতে মুখ তুলে স্নিগ্ধকণ্ঠেই বললে 'আয়।'

বোধ হয় ওর কণ্ঠস্বরে অভয় পাওয়ার জন্যই গোপালের চোখে আবার জল এসে গেল। সে হঠাৎ ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে বিমলের দুটো পা চেপে ধরে বললে, 'দাদাবাবু আমাকে মাপ করো —আর কখনও এমন হবে না!'

সস্নেহে ওর মাথাটা কোলের ওপর টেনে এনে বিমল বললে, 'দূর পাগল, তোর দোষ কি! তারপর একটুখানি ইতস্তত ক'রে বললে, 'বড্ড লেগেছিল, না-রে? খুব ব্যথা হয়েছে?'

গোপাল প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে জানাতে গেল যে তার খুব লাগেনি কিন্তু বিমল মৃদু ধমক্ দিয়ে উঠল 'না লাগেনি! ফের মিছে কথা বলছিস্!'

গোপাল ওর কোলের ভেতর মুখ গুঁজে চোখের জল মুছছিল, উত্তর দিলে না। একটু পরে বিমলই আবার বললে, 'তুই অমন করলি কেন, কেন আমার কথা শুনলি না—তাই ত আমার রাগ চড়ে গেল! আর কখনও অমন করিস্ নি। বুঝলি?'

গোপাল তবু জবাব দিলে না।

বিমল আস্তে আস্তে একটু যেন সন্দিগ্ধকণ্ঠেই বললে, 'ভাগ্যিস্ আসল কথাটা বলে দিস্‌নি। কাল আর একটা চিঠি লিখে দেব, সেটা যেমন ক'রেই হোক পৌঁছে দিতে হবে। বুঝলি।'

এবার গোপাল মাথা তুললে। বললে, 'আমাকে মেরে ফেল দাদাবাবু কিন্তু ওসব আর ক'রো না।'

বিমলের গলা আবার কঠিন হয়ে এল। বললে, 'আচ্ছা আচ্ছা,

উপদেশ শুনতে চাইনি আমি। আমার যা খুশি তাই করব—চাকরের হুকুম নিয়ে চলতে হবে নাকি আমাকে? যা বলছি তাই শুনবে—যা করেছ, করেছ—এসব আমি আর বরদাস্ত করব না।'

গোপাল মাথা হেঁট ক'রেই জবাব দিলে, 'কী দেখেছ দাদাবাবু ওর মধ্যে? তোমার মত এত বড় বংশের ছেলে—এই রূপ, লেখাপড়া জানো, তোমার কাছে ত ও বাঁদরী। তোমার সুন্দরী বউ-এর অভাব কি? ওকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি ক'রো না।'

অসহিষ্ণু বিমল চাপা ধমক দিয়ে বললে, 'ফের ঐ সব কথা, একদিন বুঝিয়ে দিয়েছি না যে, আমি ওকে ভালবাসি, ওকে আমার চাই-ই। তুমি ওর নিন্দে আমার কাছে করবে না। তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি তারই জবাব দাও—পারবে, না পারবে না?'

'আমি পারব না দাদাবাবু।'

অসহ্য ক্রোধে এবেলাও বিমলের কপালে দুটো শির ফুলে উঠ্‌ল কিন্তু প্রাণপণে ও আত্মদমন করলে। আর একটা কথাও না বলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। গোপাল অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকবার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ওর বহুদিনের অব্যবহৃত বিছানাতেই শুতে গেল। ওর মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে বিমল হয়ত একটু পরে ওকে ডাকবে কিংবা আর একবার কথা কইবে, তাই অনেক রাত্রি অবধি সে চেষ্টা ক'রেই জেগে রইল কিন্তু ও-তরফ থেকে কোন সাড়াই এল না, বরং একটু পরে বিমলের নিয়মিত নিঃশ্বাসের শব্দে বুঝতে পারলে যে সে ঘুমিয়েই পড়েছে।

পরের দিন থেকে বিমল খুব গম্ভীর হয়ে গেল। এ সম্বন্ধে আর কোন কথা ত কইলেই না গোপালের সঙ্গে, এমনিই কথা কওয়া ছেড়ে

দিলে। এর চেয়ে যদি আরও বকাবকি করত বা ওকে ধরে মারত, তাহ'লে ভাল ছিল। বিমলের এই উদাসীন ভাবটাই ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। সে বেশ সহজ ভাবেই প্রয়োজনমত ওকে ফরমাশ করে। স্নানের সময়, প্রসাধনের সময় নিয়মিত সাহায্য নেওয়াও বন্ধ হ'ল না, শুধু প্রভু-ভৃত্যের যে একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল সেইটেই যেন নষ্ট হয়ে গেল। আগে আগে এইসব সেবার সময়গুলিতে দুজনে গল্প জম্‌ত খুব, বিমলই বলত বেশীর ভাগ—কলেজের গল্প, খেলার মাঠের গল্প, কত কি—এখন সেই সব নিস্তব্ধ সময়গুলো যেন পাষাণের মত ভারী হয়ে চেপে বসল গোপালের বুকে।

এটা যদি শুধু অভিমান হ'ত তাহ'লে গোপাল অতটা ভাব্‌ত না—ওর ভয় হতে লাগল যে এই ঔদাসীন্য চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। এর পর ওদের সম্পর্ক শুধু সাধারণ প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কেই পর্য্যবসিত হবে। অথচ কি ক'রে যে এর প্রতিকার হ'তে পারে তা গোপাল কিছুতেই ভেবে পায় না।

পারুলকে ও দেখতে পারে না—এইটাই সত্য কথা, প্রথম থেকেই ওর গায়ে-পড়া ভাব দেখে গোপালের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যেত, কোন মতেই ওর প্রতি বিমলের অনুরাগটাকে মেনে নিতে পারত না। এর মধ্যে গোপালের কোন ঈর্ষার কথা ছিল কি-না তা সে ভেবে দেখেনি দেখা বোধ হয় ওর পক্ষে সম্ভবও নয়, শুধু অকারণ এবং অবোধ একটা রাগে সে জ্বলে যেত।

এখনও, বিমলের প্রীতি হারাবার ভয়েও, সে সহজে এ ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারলে না। বিমল যে পারুলকে প্রতিদিন চিঠি লিখ্‌ছে আর জবাব পাচ্ছে এটা সে বুঝতে পারে, অর্থাৎ সে রাজী

না হ'লেও এ কাজের জন্য বিমলের লোকাভাব হয়নি। হয়ত বাড়ীর কোন ঝি-ই বখ্শিষের লোভে জেনে শুনে বিমলের সর্ব্বনাশ করছে। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই তাই। গোপালের অনেকবার মনে হ'ল যে হরিপদবাবুকে সে সব কথা বলে দেয়—কিন্তু তাতে বিমলের পরিণামটা কল্পনা ক'রে কিছুতেই সাহসে কুলোল না। অথচ এমন ক'রে নিস্পৃহ-ভাবে দাঁড়িয়ে দেখাও ওর অসহ্য! নিষ্ফল ও অসহ্য দাহে তার মন বার বার মাথা কোটে—কিন্তু কোন উপায় কোথাও দেখা যায় না।

এমনি ক'রে তিন চার দিন কেটে গেল। বিমল যেন বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে অর্থাৎ খুশীর কারণ ঘটেছে কোথাও। এমন কি সে গোপালের সঙ্গে হেসেই কথা বলে আজকাল—যদিও গোপাল বেশ বুঝতে পারে যে আগেকার অন্তরঙ্গতার সুর কেটেছে। তাকে প্রয়োজন নেই বলেই অভিমানবোধও নেই। সে নিতান্তই চাকর,—সাধারণ আর পাঁচটা চাকরের মতই।

অবশেষে একদিন গোপালকে আত্মসমর্পণ করতে হ'ল।

রাত্রিবেলা বিমলের পা জড়িয়ে ধরে বললে, 'দাদাবাবু, আমাকে মাপ করো, যা বলবে তাই শুনব—তুমি অমন করে থেকো না।'

বিমল প্রথমটা ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিলে, 'কৈ আমার ত তেমন কোন দরকার নেই। আচ্ছা, দরকার হ'লে জানাবো।'

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গোপালের অবস্থা দেখে ওর দয়া হ'ল। বললে, 'ত্যাখ্, কাল শনিবার দারোয়ান সন্ধ্যা বেলা যাবে বাড়ীভাড়া আদায় করতে, ন-টা দশটার আগে ফিরবে না। ওর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছে আছে। কথা আছে পারুল কাল সন্ধ্যার পর দেউড়ীতে ওর ঘরে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তোকে কাল ঐ সময়টায়

একটু দেউড়ীর কাছে কাছে থাকতে হবে। হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে—ধর, যদি দারোয়ানই কোন কারণে ফিরে আসে—আমাদের আগে খবর দিবি। বুঝলি?'

গোপালের মনে হ'ল কী একটা ঠাণ্ডা-মত যেন ওর পিঠের শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে গেল। অনেক চেষ্টায় আড়ষ্টভাবে ঘাড় নেড়ে শুধু ওর সম্মতি জানালে। কথা কইতে পারলে না। বিমল বোধ হয় আরও অনেক কথা বললে কিন্তু কোনটাই গোপালের কানে গেল না, চমক ভাঙল একেবারে বিমল শুয়ে পড়তে। গোপালও নিঃশব্দে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিমলের তরফ থেকেও কোন নিমন্ত্রণ এল না, সেও তার কাছে যাবার কোন চেষ্টা প্রকাশ করলে না। কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল গোপাল—দীর্ঘনিঃশ্বাসও ওর পড়ল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, দেউড়ীর বড় ঘড়িতে একটার পর একটা ঘণ্টার আওয়াজ কানে আসতে লাগল—কিন্তু গোপালের চোখে ঘুম এল না। অবশেষে চারটে বাজার শব্দ কানে যেতেই ও উঠে পড়ল। সন্তর্পণে দোর খুলে দালানে বেরোল, সেখান থেকে নীচে, তারপর আস্তে আস্তে সদর খুলে বেরিয়ে পড়ল একেবারে বাগানে।

দারোয়ান তখনও ওঠেনি, সুতরাং ফটক খোলার চেষ্টা না ক'রে গোপাল পাঁচিল টপ্‌কেই রাস্তায় নেমে গেল।

কে জানে কোথায়—

এখনও কেউ জানে না। কারণ সে এ বাড়ীতে ফেরেনি। কাপড়-জামা একটাও সে নিয়ে যায়নি, এমন কি সরকার মশাইয়ের কাছে

ওর মাইনের টাকা জমা থাকত—তাও তেমনি আছে। একবস্ত্রে নিঃসম্বল অবস্থাতেই চলে গেছে।

প্রথমটা সকলে চুরি সন্দেহ করেছিল কিন্তু যখন জানা গেল যে সে কিছুই নিয়ে যায়নি তখন সকলে আরও বিস্মিত হ'ল। হরিপদবাবু হাসপাতালে হাসপাতালে খবর নিলেন কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান মিল্‌ল না। সে বোধ হয় এ অঞ্চল থেকেই চলে গেছে একেবারে, চিরকালের মত।

বিমল অনেক ভেবেও ওর এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের কারণটা বুঝতে পারলে না।

অকৃতজ্ঞতা

২৯শে শ্রাবণ নেড়ীর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেল। সবাই বললে, 'যাক্—এতদিন পরে নেড়ীর একটা হিল্লে হ'ল!'

নেড়ী নাম বটে তবে ওটা ওর ওপর বিধাতার পরিহাস। জন্মের সময় নাকি মাথায় ওর মোটে চুল ছিল না—মা-বাবা তাই নাম রেখেছিল নেড়ী। জন্মকালের সে দৈন্য ওর ঘুচে গিয়েছিল উত্তর-কালে—মেঘের মত নিবিড় কালো চুল ওর পিঠ, কোমর ঢেকে আরও নীচে নামত। খোঁপা বাঁধলে মনে হ'ত কালো কাপড়ের একটা পুঁটুলী ঝুলছে কাঁধের ওপর। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই—মেয়েটার যেমন রাত তেম্‌নি চেহারা। শ্রী বল্‌তে কোথাও কিছু ছিল না। রং য খুব কালো তা নয়, মুখ-চোখ নাক-কানেও ভয়ানক রকমের সৌষ্ঠব ছিল না, দৈহিক গড়ন চলন-সই—তবু সবটা জড়িয়ে কোথায়

যেন একটা ছন্দের অভাব ছিল। খুব কুৎসিত মেয়ে হ'লেও লোকে তার দিকে চেয়ে দেখে, সুন্দরী হ'লে ত কথাই নেই—নেড়ীর ছিল পাঁচজনের ভীড়ে হারিয়ে যাবার মত চেহারা, অর্থাৎ কেউ লক্ষ্য করবে না এমন। ওর মামী নাক তুলে বলতেন, 'ছুঁড়ীর এক তাল চুল থাকলে কি হবে, যা ছাতা-পড়া মুখ!'

আর অদৃষ্টও কি তেমনি! মা মারা গিয়েছিলেন নেড়ী হবার বছর দুইএর মধ্যেই। ছোট মেয়ে মানুষ করা কষ্টকর বলে মাস-খানেক পরেই ওর বাবা হরেকৃষ্ণ আবার বিয়ে করলে! কিন্তু মেয়েটা যে ভাবে মানুষ হতে লাগল তা দেখে চোখের জল সামলাতে না পেরে মামা গিয়ে একদিন ওকে নিয়ে এলেন তার বাড়ী। বলা বাহুল্য হরেকৃষ্ণের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ এল না। মামার অবস্থা ভাল নয় তবু সেখানে সুখে না হোক্ শান্তিতে ছিল নেড়ী। কিন্তু বছর-বারো বয়সের সময় মামাও যখন মারা গেলেন তখন দাঁড়াবার ঠাঁইও রইল না। মামীর নিজেরই মাথা-গোঁজবার জায়গা নেই—ছেলে-পুলের হাত ধরে তাঁকে আশ্রয় নিতে যেতে হ'ল তাঁর ভাইয়ের বাড়ী, সেখানে পরের আই-বুড়ো মেয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না! অগত্যা নেড়ীকে আবার তার বাপের বাড়ীতেই রেখে আসা হ'ল।

নেড়ী যে হরেকৃষ্ণর মেয়ে সে কথাটা আর পাঁচজনের মত হরেকৃষ্ণ নিজেও ভুলে গিয়েছিল সুতরাং এই ঝঞ্ঝাটে সে বিষম বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। নতুন সংসারে তার ছেলেপুলের অভাব নেই, স্ত্রীও অত্যন্ত প্রখরা, হঠাৎ একটা বারো তেরো বছরের মেয়ে ঘাড়ে পড়ার জন্য সে দায়ী করলে তার অপদার্থ স্বামীকেই অর্থাৎ নেড়ী যে যথা সময়ে মরেনি এটাও হরেকৃষ্ণর চালাকী। হরেকৃষ্ণ ইতিমধ্যে বেশ

খেলে বড় লোক হবার চেষ্টা করেছিল কয়েক দিন, তার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ বিরাট ঋণের কথা ভোলবার জন্য ধরেছিল মদ। অর্থাৎ সাংসারিক অবস্থা তখন দৈন্যদুর্দশার শেষ পর্য্যায়ে এসে পৌঁচেছে।

যাই হোক—প্রথমত এই অভাবের মধ্যে আইবুড়ো মেয়েকে দেখে হরেকৃষ্ণ শালাদের ওপর খুব চটে গেলেও শিগ্‌গিরই তার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। ওর এক দূরসম্পর্কের মামা থাকতেন বর্দ্ধমানের ওদিকে কোথায়, প্রায় ষাট বছর বয়স তাঁর, তৃতীয় পক্ষ বিবাহ করবার জন্য পাত্রী খুঁজছিলেন—কিন্তু পান নি। হরেকৃষ্ণ বর্দ্ধমানে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে পাঁচশ টাকা আগাম নিয়ে এল—কথা রইল বিয়ের দিন আরও হাজার টাকা মামা ভাগ্নেকে দেবেন—তা ছাড়া বিয়ের খরচটা সমস্তই তাঁর। একে সম্পর্কটা খুব কাছাকাছি নয় তার উপর যেটা আছে সেটাও দাদামশাই নাতনীর সুতরাং বিয়ে আট্‌কায় না।

ব্যাপারটা খুব গোপন রাখার চেষ্টা করা সত্বেও কী ক'রে রটে গেল পাড়ায়। কথাটা ক্রমে তারাপদর কানেও উঠল। কিন্তু তার আগে তারাপদর পরিচয়টা দিই—

চব্বিশ পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে, সমস্ত রকম খেলা-ধূলায় ওস্তাদ, পাড়ার ছোক্‌রাদের চাঁই। বাপ নেই কিন্তু এই বয়সেই দালালী করে বিস্তর পয়সা রোজগার করেছে। টাকা উপায় করতে জানে যেমন—খরচ করতেও তেমনি। ছাতিটা বাইরে বিয়াল্লিশ ইঞ্চি, ভেতরটাও তাই, বরং মনে হয় আরও বেশী। সেইজন্য যার যা আবেদন নিবেদন সবই তার কাছে—যত কিছু খয়রাতী-ব্যাপারে সে-ই আগে

মাথা দেয়। মিশ্ কালো রং তবু সরল মধুর হাসিতে চমৎকার মানায় ওকে। এক কথায় তারাপদ সকলের প্রিয়।

বলা বাহুল্য এ হেন তারাপদর কানে যখন কথাটা পৌঁছল তখন তার তেতে উঠতে এক মিনিটও সময় লাগল না। সে আগে কোন হাঁক্ ডাক্ করলে না। বিয়ের রাত্রে যখন বর এসে পৌঁচেছে, বাড়ীর দোর বন্ধ করে গোপনে সম্প্রদানের আয়োজন চলছে, তখন তারাপদর দল পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ীতে ঢুকল। হরেকৃষ্ণের গালে প্রকাণ্ড একটি চড় বসিয়ে দিলে তারাপদ, আর কানাই দিলে বুড়ো মামার কাঁধটা ধরে একটা ঝাঁকি। বুড়োকে সাবধান করে দেওয়া হল যে প্রাণের মায়া যদি থাকে ত এ কাজ যেন আর কখনও না করে আর হরেকৃষ্ণকে তারাপদ বলে দিলে, 'সাবধান! আমাকে চেনো ত হরি কাকা!'

হরেকৃষ্ণ চড়ের ধাক্কাটা ভাল করে সামলাতে পারেনি তখনও, তবু গর্জে উঠল—'ও মেয়ে নিয়ে আমি কি করব এখন? ও যে দো-পড়া হয়ে যাবে।'

তারাপদ জবাব দিলে, 'সে তখন দেখা যাবে। ওর বিয়ের ভার আমার—

টাকা সবটাই হরেকৃষ্ণর হস্তগত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে তখন ভাবছিল এর কিছুটা ফেরৎ দিতে হবে কিনা। তাই সে একবার ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'আমার মেয়ে আমি যা খুশী তাই করব। তোমাদের কি? এরকম বেআইনী ভাবে বাড়ী চড়াও করে—'

তারাপদ পথ ছেড়ে দিয়ে বললে 'যাও না থানায়। ক্ষমতা থাকে

পুলিশে খবর দাও। তাছাড়া মেয়ের বয়স এখনো চোদ্দ হয়নি, পুলিশে যাবার আগে সে কথাটাও খেয়াল রেখো।'

তারাপদর বুকের ছাতিটার দিকে চেয়ে এবং একবার তার দলটার দিকে চোখ বুলিয়ে হরেকৃষ্ণর আর থানার কথা তুলতে সাহস হ'ল না। সে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্‌লে, 'ওর যদি আজ রাত্তিরে না বে হয় তা'হলে ওকে আর আমি ঘরে রাখতে পারব না—আমার জাত যাবে।'

তারাপদ আর দ্বিরুক্তি না করে নেড়ীর হাতটা ধরে টান দিয়ে বললে, 'উঠে আয়রে নেড়ী, আমার মা আজ থেকে তোর মা। তাই হবে হরি কাকা, ওর কথা আর তোমাকে ভাবতে হবে না—ওর ভার আমিই নিলাম।'

হরেকৃষ্ণ তবু দু-একবার ক্ষীণকণ্ঠে কি বলতে গেল—ওর স্ত্রীও ঘরের মধ্যে থেকে গজরাতে লাগল কিন্তু বেশী কিছু বল্‌তে সাহস হ'ল না। কারণ ততক্ষণে পাড়ার আরও পাঁচজনে এসে গিয়েছে গোলমাল শুনে, আর তারা সকলেই ওদের বিপক্ষ। তবে একটা সুবিধা হ'ল—হরেকৃষ্ণের মামার যা লাঞ্ছনা হ'ল সকলের কাছে, তিনি আর টাকার মায়া না করেই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

তারাপদর বাড়ীতে এসে প্রথম প্রথম নেড়ীর লজ্জা আর সঙ্কোচের অবধি রইল না। কিন্তু সে ভাবটা তারাপদই কাটিয়ে দিলে। ওর যা কিছু কাজ সব ফরমাস করে নেড়ীকে, ওর সঙ্গে খুনসুটী করে নিজের বোনের মতই—ঠাট্টা-তামাসায় গল্প-গুজবে মাতিয়ে তোলে ওকে। তাছাড়া তারাপদের মা-ও যথার্থ ভালমানুষ, তিনি ওকে মেয়ের মতই

কোলে টেনে নিয়েছিলেন—তাঁর আরও দুটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে কোথাও ওর কোন পার্থক্য রাখেন নি।

এই ভাবে প্রশ্রয় পেয়ে নেড়ী সহজ হয়ে এল। ক্রমে সে ভুলেই গেল যে এরা ওর আপনার লোক নয়, ভুলে গেল ওর বিগত জীবনের যত কিছু গ্লানি। এমন কি মামা-মামীর অভাবও ওর বেশীদিন আর মনে রইল না। নেড়ী তার আবদারে ফরমাসে তারাপদকে অস্থির করে তুললে। তারাপদও ওকে যখন কুড়িয়ে এনেছিল তখন এত কিছু ভাবেনি কিন্তু এখন যেন নেড়ী যে ওর নিজের বোন নয় তা ভাবতে কষ্ট হয়। ছোট ভাইবোন-দুটিও নেড়ীর আপনার হয়ে উঠেছিল। নেড়ীর অন্তরের কৃতজ্ঞতা তারাপদকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজো করত। ওর সব কাজ নেড়ীর নিজে করা চাই। ঝি আছে, চাকর আছে তবু ওর কাপড় কাচ্‌বে নেড়ী নিজে হাতে; ওর গেঞ্জিতে সাবান দেওয়া, জুতোয় কালী মাখানো, ওর কাপড় কুঁচিয়ে তুলে রাখা ওর ঠাঁই করা, জল-খাবার দেওয়া—এ-সব কোন কাজই নেড়ী আর কাউকে করতে দেয় না। একটা কান আর একটা চোখ তার সর্ব্বদা যেন তারাপদর দিকে পাতা থাকে। তারাপদ এম্‌নি অন্যমনস্ক, কোন ব্যাপার চট্‌ করে ওর নজরে পড়ে না, কিন্তু নেড়ীর এই একান্ত সেবা তার চোখেও ধরা পড়ে আর সে তাতে খুশী না হয়ে পারে না। ওর মনে হয়, এতদিন ওর নিজেরই বোন যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, আবার ও ফিরে পেয়েছে।

হয়ত বা সেই জন্যই—নেড়ীর বিয়ে দেবার দায়িত্বটা তারাপদ যেন কতকটা ভুলেই যায়। মাসের পর মাস কাটে, বছরের পর বছর। নেড়ী ষোল পেরিয়ে সতেরোয় পা দিলে। মা তাগাদা করেন। আগে

তারাপদ জবাব দিত, 'এখন ওর বিয়ে দিয়ে কে সর্দ্দা আইনে পড়বে!' কিন্তু সে জবাব আর দেওয়া যায় না—এখন বলে, 'পাত্র একটা খুঁজে দেখি ভালো গোছের—যার তার হাতে ত দিতে পারিনে!' ক্রমে সে জবাবও ফুরিয়ে যায়।

অগত্যা শেষ পর্য্যন্ত তারাপদকে বেরিয়ে পড়তে হয় পাত্রের খোঁজে। পাত্র অনেক আসে কিন্তু পাত্রীর রূপ তাদের পছন্দ হয় না। নেড়ীর অন্তরের যে রূপটি তারাপদর চোখে পড়েছে তাতে বাইরের চেহারাটার কথা তারাপদ ভুলেই গেছে—সে অবাক্ হয়ে ভাবে কেন নেড়ীকে ওরা পছন্দ করে না। আবার যারা নেড়ীকে পছন্দ করে তারাপদর কাছে তারা ঠিক পছন্দ-সই নয়। এমনি করে আরও বছর-খানেক কাটিয়ে তারাপদ এক জায়গায় সম্বন্ধ পাকা করে ফেল্লে। পাত্র বি-এ পাস, সরকারী চাকরী করে—বাড়ী-ঘর-দোরও আছে, এক কথায় সব দিক দিয়েই লোভনীয়। তারা সব কথা শুনে নিতে রাজী হয়েছে—নগদও তারা কিছু চায় না, সবসুদ্ধ তারাপদর হাজার দুই টাকা খরচ। পুরুত এসে দিন দেখে দিয়ে গেলেন—২৯শে শ্রাবণ।

কিন্তু এ খবরে সবাই আনন্দিত হ'লেও যার সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাবার কথা সেই নেড়ীর একটা আশ্চর্য্য ভাবান্তর হ'ল। এ বাড়ীতে আসবার পর একটু একটু ক'রে যে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছিল ওর মুখে —অন্তর-মাধুর্য্যের সেই পরিপূর্ণ শতদলটি যেন কেমন ম্লান হয়ে আস্তে লাগল। তারাপদ নিজের খেয়ালেই নিজে মেতে ছিল, হৈ-চৈ, বাজার হাট—বিয়ের আয়োজনে সে ছিল ব্যস্ত, কোথাও কোন ত্রুটী থাক্তে দেবে না সে নেড়ীর বিয়েতে, এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। নেড়ী যে তার আপন বোন নয়—এ কথা কেউ না বুঝতে পারে, তার জন্য সে প্রাণপণ

করেছে। কিন্তু তবু এক সময়ে নেড়ীর মনের এই বেসুরটা তার কানেও বাজ্‌ল। এক দিন সে নেড়ীকে কাছে ডেকে সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে চুপি চুপি প্রশ্ন করলে 'তোর ব্যাপার কি বল্‌ত নেড়ী? এ বর কি তোর পছন্দ নয়।'

নেড়ী নত-মুখে বললে, 'কে বলেছে?'

'তবে তোর মুখ অত শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?…আমি কার জন্য এত কাণ্ড করছি বল্ দেখি? ওরা যা চেয়েছে তার ডবল গয়না তোকে আমি গড়িয়ে দিচ্ছি। আরও কি চাস্ তুই বল। মোদ্দা মুখ ভার করে থাকলে চলবে না।'

হঠাৎ নেড়ীর দুই চোখের কোণ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সে বলে ফেললে, 'আমার বিয়ে দিও না বড়দা, তোমার পায়ে পড়ি।'

হতবুদ্ধি তারাপদ প্রশ্ন করলে, 'কেন রে? কি হল?'

নেড়ী প্রায় রুদ্ধ-কণ্ঠে জবাব দিল, 'আমাকে তোমার কাছে রাখতে পার না? আমি ঝি হয়ে থাকব। আমাকে আর কোথাও পাঠিও না, আমি থাকতে পারব না।'

তারাপদ ওর মাথাটা কাছে টেনে এনে নিজের কোঁচার খুঁটে ক'রে চোখ মুছিয়ে দিয়ে হেসে বললে, 'দূর পাগলী! আমি বলি না জানি কি ব্যাপার। ঝিয়ের মত কেন ভাই, বোনকে লোকে মাথায় করে রাখে। কিন্তু চিরকাল যে তোদের রাখা যায় না—পরের ঘরেই পাঠাতে হয়—সেটা ভুলে যাস্ কেন। বিশেষ ক'রে তোর ব্যাপারে আমার কত বড় দায়িত্ব বল্ দেখি—বিয়ে না দিলে লোকের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে?'

নেড়ী আর কোন জবাব দিলে না—এক রকম জোর ক'রেই

তারাপদর হাত ছাড়িয়ে চলে গেল। কথাটা নিতান্তই জোলো হৃদয়াবেগ, এই মনে ক'রে তারাপদও ভুলে গেল। চকচকে বাড়ী আর ঝক্‌ঝকে গয়নাতে আবার নেড়ীর মুখে হাসি ফুটবে, এই মনে ক'রে সেই দিকেই মন দিলে।

তবু হাসি ফোটে না। বরং বিয়ের আগের দিনে আর একবার নেড়ী ওকে ছাদের ওপর একা পেয়ে যেন ভেঙ্গে পড়ল—'বড়দা বিয়ে কি বন্ধ করা যায় না?'

তারাপদ সস্নেহে ধমক্ দিয়ে উঠ্‌ল, 'ফের্ ঐ সব পাগলামী!... এতদিন পরে ত নিজের ঘরে যাচ্ছিস্ তবে আর কি?'

বিয়ে এসে পড়ল। তারাপদ ঘটার কোন ক্রটি করেনি। সত্যিই যা কথা ছিল দেবার, ও তার ডবল দিয়েছে। রসুন চৌকি, ম্যারাপ —নিজের বোনের মতই সাড়ম্বরে বিয়ে দিলে সে। লোকও খেলে ঢের; একা একশ' হয়ে তারাপদ খেটে বেড়াতে লাগল—তারই উৎসাহ আর আনন্দ যেন সব চেয়ে বেশী। ঠাট্টা-তামাসা হাসি-খুশির মধ্যে দিয়ে নিরাপদে চার হাত এক হ'য়ে গেল—আনন্দ উৎসবের ক্রটী ঘটল না। সবাই একবাক্যে বললে, হ্যাঁ, তারাপদ মরদ কি বাচ্চা বটে! শুধু নেড়ী সেই বিকেলে ধমক খাবার পর থেকে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। ভাবলেশহীন ওর মুখ—আনন্দ কি দুঃখ সে মুখে খুঁজে পাওয়া যায় না। যে-যা বলছে ক'রে যাচ্ছে কলের পুতুলের মত। মেয়েরা একদল বললে—'আহা, এইটেই ভ ধরতে গেলে ওর বাড়ী গা—ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে বৈ-কি।' আর একদল বললে, 'দেখেছ, এখানে যে এতদিন রইল রাজার হালে—তা পোড়া চোখে একবিন্দু জল নেই। মিনিট গুনছে যেন, কতকালে

শ্বশুরবাড়ী যাবে!' নেড়ী কিন্তু নির্ব্বিকার, এমন কি বিয়ের পর দিন তারাপদ আর তার মা হাতে হাতে সঁপে দেবার সময় কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন, নেড়ী আর একদিক পানে চেয়ে নিথর হয়ে বসে রইল—চোখের পাতাও ওর ভিজল না।.......

বিদায়ের সময়ে সবাই আশা করেছিল নেড়ী ভেঙ্গে পড়বে, কিন্তু সে স্থির-ভাবেই সকলকে প্রণাম করে গাড়ীতে গিয়ে উঠল। তারাপদর মা ক্ষুণ্ণ হলেন—আর সকলের কাছে নিজেকে যেন অপমানিত বোধ করতে লাগলেন—কিন্তু এ হৃদয়হীনতার কোন অর্থই খুঁজে পেলেন না।

নেড়ী কথা কইলে একেবারে স্টেশনে গিয়ে। পাত্রপক্ষ থাকে পাটনা—তারাপদ ওদের হাওড়া স্টেশনে তুলে দিতে এসেছিল। গাড়ী ছাড়বার ঠিক আগের মুহূর্ত্তে ক্ষুব্ধ তারাপদ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'জানি না ভাই কোথায় কি অপরাধ ঘটল আমার। কি ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছিল, আমাকে বল্লি না কেন—যেমন করেই হোক আমি সেরে নিতুম।'

হঠাৎ নেড়ীর চোখ যেন জ্বলে উঠল। মাথাটা বাড়িয়ে বললে, 'একটা কথা আমার রাখবে বড়দা? যা বলব শুনবে?'

ব্যগ্র-কণ্ঠে তারাপদ বললে, 'শুন্‌ব বৈ কি রে নিশ্চয় শুন্‌ব। কী চাই বল—'

নেড়ী দুটি হাত জোড় করে বললে, 'আর আমাকে ফিরিয়ে এনো না। এইটে শুধু আমি চাই—আমার খোঁজ আর কোন দিন নিও না। এইটুকু পারবে না করতে আমার জন্যে?'

কথাটা কি ক'রে এ বাড়ীতে এসে পৌঁছল। এত বড় অকৃতজ্ঞতায় আকাশ বাতাস যখন নেড়ীর নিন্দায় মুখরিত হয়ে উঠেছে তখন কে

জানে কেন তারাপদ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। দু-তিন দিন পরে ওর মায়ের বিলাপের উত্তরে এক সময়ে শুধু সে বলে উঠেছিল, 'মুখের কথাটা দিয়েই সব সময়ে মানুষের বিচার ক'রো না মা—মানুষ সত্যিই অত অকৃতজ্ঞ নয়।'

অন্যমনস্ক তারাপদ হয়ত নেড়ীর কথাটা এতদিন পরে বুঝতে পেরেছে—কে জানে!

ইজ্জৎ

কুন্তী ছেঁড়া কাপড়খানা কোলে করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। আলোতে বেশী তেল নাই, ডিবাটা এখনই হয়ত নিভিয়া যাইবে—তবু কাপড় সেলাই করার কোন চেষ্টাই তার দেখা গেল না। যাহা অসম্ভব, যাহা আর কোন রকমেই করা যাইবে না, তাহার পিছনে বৃথা পরিশ্রম করিবার ইচ্ছা আর নাই—যাহা হইবার হউক।

তাহার শাড়ী ত গিয়াছেই বহুদিন, গুপীর দুইখানা ধুতির দুইপ্রান্ত ছিঁড়িয়া সেলাই করিয়া একটা যেমন-তেমন পরিধেয় প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল, সেখানাও ছিঁড়িয়া গেলে নিজের বহু পুরাতন শাড়ী হইতে টুক্‌রা বাছিয়া বাছিয়া তালি দিয়াছিল। একে ত সে ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছিল বাউলের আল্‌খাল্লার মত নানা বর্ণের ও বিচিত্র, তা-ও আবার এমন ভাবে ছিঁড়িয়াছে যে কোন মতেই তাহার সংস্কার করা যায় না। যে কাপড়ের খণ্ডগুলিতে এই অপরূপ পরিধেয়টি প্রস্তুত হইয়াছিল—সেগুলিও জীর্ণতার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে

সেলাই করিলে সেলায়ের সুতা পচা কাপড়ের বন্ধন কাটাইয়া অনায়াসে বাহির হইয়া আসে—শুধু শুধু সুতাটাই নষ্ট হয়।

অথচ উপায় বা কি?

গুপী ত বহুকালই কাপড় পরা ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা গামছা গুছাইয়া পরিত এতদিন, এখন সেটাও গিয়াছে, কোন মতে কৌপিনের মত করিয়া পরে। ছেলেমেয়েরা ত উলঙ্গ হইয়াই থাকে। ছেলেটা আট বছরের হইল প্রায়, উলঙ্গ হইয়া থাকাতে তাহার দস্তুর মত আপত্তি—কোন মতে বুঝাইয়া সুঝাইয়া ধমক্ দিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু কুন্তীর কি উপায়? ঘরে থাকিলেও না হয় কথা ছিল, বুড়া স্বামী আর শিশু পুত্রকন্যা—তাহাদের কাছে লজ্জা না হয় না-ই থাকিত কিন্তু তাহাকে যে বাহিরে কাজে যাইতে হয়—একটা কিছু না জড়াইলে যে চলে না! তাহার উপর ভগবান তাহাকে কি যৌবনও দিয়াছেন অফুরন্ত! এত কষ্টে, এত অনাহারেও দেহের পুষ্টতা যায় না—অনেকখানি কাপড় ঘিরিয়া না ঢাকিলে তাহার মনে হয় বিশ্বের সমস্ত পুরুষের দৃষ্টি যেন তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

আগে তবু বাজারে ছেঁড়া কাপড় বিক্রী করিতে আসিত—এখন একফালি ন্যাকড়াও কোথাও পাওয়া যায় না। মনিব-বাড়ীতে ছেঁড়া কাপড় চাহিলে তাহারা বলে 'তার চেয়ে একটা টাকা চাইলে অনায়াসে দিতে পারি—কাপড় কোথায় পাবো বাছা?' কালই-ত ভট্‌চায্‌-গিন্নী বলিলেন, 'আমরাই ছেঁড়া কাপড় সেলাই ক'রে চালাচ্ছি মা—আরও কতকাল চালাতে হবে কে জানে, এখন তোকে কোথা থেকে দেবো বল্! হাজার হোক্ তোরা হলি ছোটলোক—ন্যাংটো হয়ে বেরোলেও লোকে কিছু বলবে না কিন্তু আমাদের একটা ইজ্জৎ আছে ত! ত্যাখ্

না, বড় বৌ কাপড়ের অভাবে বেনারসী পরে রান্না করছে। তখনই ওর দাম নিয়েছিল দেড়শ' টাকা—এখন কিনতে গেলে বোধ হয় পাঁচশ' টাকা পড়ত।'

কথাটা মনে হইয়া কুন্তীর বুক হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস যেন ঠেলিয়া বাহির হইল। ছোটলোক—তাই বটে! ছোট লোক বলিতে ইহারা যাহা বোঝেন সে 'অবস্থা' কুন্তীদের কখনও ছিল না—পিতৃকুলেও না, মাতৃকুলেও না। ইজ্জৎ তাহারও ছিল একদিন—আর উঁহাদের চেয়ে কম ছিল না! সে ঘরামীর মেয়ে, তাহার বাবা কার্ত্তিক অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া সংসার চালাইয়াছে তবু কখনও বাড়ীর মেয়েদের বাহিরে কাজ করিতে দেয় নাই। শ্বশুর বাড়ী আসিয়াও সেই ব্যবস্থাই সে দেখিয়াছে—গুপীর জমি-জমা ছিল না বটে বিশেষ, তবু ভিটের সঙ্গে যে বাগানখানা ছিল তাহাতেই তরি-তরকারীটা পাইত যথেষ্ট, আর সে নিজে পরের ক্ষেতে বাগানে খাটিয়া, ঘরামীদের জোগান দিয়া—যেমন করিয়া হউক সংসার চালাইত। কুন্তীকে কখনও কাহারও কাছে হাত পাতিতেও হয় নাই—কখনও পরের বাড়ী কাজ করিতেও যাইতে হয় নাই। ভাত সেখানে সুখের না হোক, সম্মানের ছিল।

তারপর কোথা হইতে যে কি হইল—এই পোড়ার যুদ্ধ বাধিয়া তাহাদের সোনার সংসার যেন ছারখার করিয়া দিল। পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে গেল তাহাদের গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া। বড় বড় সম্পন্ন চাষীরা কেহ সপরিবারে অনাহারে মরিল, কেহ বা অবশিষ্ট কয়জনের হাত ধরিয়া শহরের দিকে গেল ভিক্ষা করিতে। অন্ন কাহারও গৃহে নাই, কে গুপীকে কাজ দিবে, কে-ই বা ভাত দিবে! যা কিছু ছিল, বাসন-কোসন পর্য্যন্ত বেচিয়া কয়েকদিন চলিল; তাহার পর

শুরু হইল দিনের পর দিন নিরম্বু অনাহার। ছেলেমেয়েগুলা শুকাইয়া, কুঁকড়াইয়া উঠিল—একটা ত মরিয়াই গেল। সব চেয়ে দুরবস্থা বৃদ্ধ গুপীর। কুন্তীর সহিত যখন গুপীর বিবাহ হয় তখন গুপীর বয়স প্রায় ত্রিশ আর কুন্তীর সাত। ফলে কুন্তী বড় হইয়া গৃহিণী হইতে হইতে গুপী গিয়াছিল বুড়াইয়া। সে যেন এই দৈব-বিড়ম্বনায় দিশাহারা হইয়া গেল। না পারে কিছু করিতে না পারে কিছু ভাবিতে। পেটের জ্বালায় ছেলে-মানুষের মত কাঁদে শুধু।

সে দুর্দ্দিনে তাই কুন্তীকেই উদ্যোগী হইয়া ঘর ছাড়িতে হইয়াছিল। শূন্য ঘরে একটা তালা লাগাইয়া এক বস্ত্রে স্বামী-পুত্র-কন্যার হাত ধরিয়া শহরে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার এক ধর্ম্ম-মা আগেই এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে কুন্তী খবর পায় যে এখানে যুদ্ধের দৌলতে অনেকেরই হাতে দু-পয়সা হইয়াছে, চল্লিশ টাকা মণ চাল কিনিয়াও তাহারা ঝি চাকর রাখে—এখানে আসিলে কাজের অভাব হইবে না। আর কাজ পাইয়াও ছিল কুন্তী আসা মাত্র। তিন চারটি বাড়ীতে সে ঝিয়ের কাজ লইল—পাঁচ ছয় টাকা করিয়া বেতন, অন্ততঃ উপবাসের-চেয়ে ভাল। এক মনিব সরকারী লঙ্গরখানা হইতে এক-থালা করিয়া খিচুড়ীর ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। গুপীও একটা বাগানে কাজ পাইয়াছিল, অবসর-মত হালকা মোট দুই একটা বহিয়াও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিত। অর্থাৎ অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে সেযাত্রা তাহারা বাঁচিয়া গেল।

সেই হইতে কুন্তীরা এখানেই আছে। দুর্ভিক্ষ মিটিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু গ্রামের শ্রী ফিরিতে এখনও অনেক দেরী। তাছাড়া যখন কাজ কোথাও করে নাই তখন ছিল এক কথা, এখন নিজে উপার্জ্জন

করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ জীবন-যাত্রার স্বাদ পাইয়াছে, অনিশ্চয়তার মধ্যে যাইতেও ইচ্ছা করে না। গুপীও গত দুর্ভিক্ষের ধাক্কায় কেমন যেন জবুথবু হইয়া গিয়াছে, সে কি আর পারিবে আগের মত খাটিতে ?…এই সব সাত পাঁচ ভাবিয়া কুন্তীর দেশে ফিরিয়া যায় নাই। ছেলেটা বড় হইয়া উঠিলে যাহা হয় হইবে।

কিন্তু চালের দুর্ভিক্ষ যদি বা কমিল, এ এক নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিল—কাপড়ের দুর্ভিক্ষ। সত্য-সত্যই যে কাপড়ের এমন অভাব হইতে পারে তাহা কুন্তী স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই, নহিলে সে যেমন করিয়াই হউক সময় থাকিতে একখানা আধখানা কিনিয়া রাখিত। মনিবদের উপরও ভরসা ছিল তাহার খুব বেশী—তাঁহারা যখন মন্বন্তরের সময় চালের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন, তখন কাপড়ের যোগাড় আর হইবে না—নিশ্চয়ই যাহা হউক একটা উপায় হইবেই। মানুষ কি সত্যই উলঙ্গ হইয়া থাকিবে !

কিন্তু এবার মনিবরাও হার মানিলেন। কাপড় কোথাও নাই। কলিকাতায় নাকি দেশী কাপড় পাওয়া যায়—সে ত্রিশ বত্রিশ টাকা জোড়া। মনিবরা তাহাই লোক মারফৎ দুই একখানা আনাইয়া লইতেছেন, কিন্তু সে সাধ্যও সকলের নাই। সেলাই তালি দিয়া যতটা সম্ভব লজ্জা নিবারণ করিতেছেন তাঁহারাই, ঝিয়ের লজ্জার কথা এ সময়ে ভাবিতে গেলে চলে না। কুন্তীরই বা আয় কি, স্বামী-স্ত্রী দুইজনের মিলাইয়া মাসিক আয় টাকা-কুড়ি। তাহাতে দুটা ছেলেমেয়ে সুদ্ধ কোনমতে এই বাজারে নুন ভাত জোটে মাত্র। তিন টাকা ঘর ভাড়া তাও যেন কষ্টকর মনে হয়। ইহার মধ্যে দশ বারো টাকায় একখানা কাপড়ের কথা সে ভাবিতেও পারে না।

অথচ, কাপড় যে কোথাও নাই তাহা নয়। মারোয়াড়ী কাপড়-ওলাটা ত' কবেই ঘর খালি করিয়া বসিয়া আছে কিন্তু সেদিন পুলিশ পড়িতে কতগুলা কাপড় বাহির হইল! সে কাপড় অবশ্য সরকারেই জমা হইয়া গেল—এখানকার লোকের কোন সুরাহা হইল না বটে কিন্তু ছিল ত! বাজারের ধারে একটা বুড়া বাঙ্গালী দোকানদার আছে, এধারে পরম বৈষ্ণব কিন্তু সেও নাকি কাপড় কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছে। চেনা লোক পাইলে সাত আট টাকায় দুই টাকার কাপড়খানা বেচিতেছে। অত টাকা ত কুন্তীর নাই—ধার করিবারও সাহস নাই। মাসে একটা টাকা বাঁচানোও কষ্টকর, ধার শোধ করিবে সে কেমন করিয়া? তা ছাড়া ধার দিবেই বা কে? এম্নি দুই এক টাকা মনিব বাড়ী আগাম চাহিলে তাঁহারা বিরক্ত হন।...

একটা উপায় আছে!

কিন্তু কথাটা ভাবিতেই কুন্তীর সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায়, ক্ষোভে, লজ্জায় যেন শিহরিয়া উঠিল। এখানকার বাসনওয়ালা লালাজীর কাছে নাকি দুই একজোড়া কাপড় এখনও আছে—সে আঠারো কুড়ি টাকায় বেচিতেছে। কুন্তির দুর্ব্বুদ্ধি—একদিন তাহার কাছে কথাটা পাড়িতে গিয়াছিল, যদি গরীব মানুষ বলিয়া দয়া করিয়া তাহাকে একখানা ছোট কাপড় কম দামে দেয়, সে মাসে এক টাকা করিয়া শোধ দিবে যেমন করিয়া হউক, না খাইয়াও। লালা তাহার গঞ্জিকা-রঞ্জিত দাঁতগুলি বাহির করিয়া তাহাকে জানাইয়া দিল যে বিক্রী করিবার মত কাপড় তাহার কিছু নাই, তবে যদি কুন্তী দোকান বন্ধ করিবার পর তাহার সঙ্গে দেখা করে এবং গা-হাত-পা একটু করিয়া টিপিয়া দেয় তবে সে হয়ত একখানা এমনিই দিতে পারে।

কুন্তীর কথাটা বুঝিতেই একটু বিলম্ব হইয়াছিল। এমন নির্লজ্জ
প্রস্তাব যে কেহ করিতে পারে, তা ছিল তাহার ধারণার অতীত।
স কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে লালার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার
পর তাহার দৃষ্টির মধ্যে ভাষাটার আসল অর্থ খুঁজিয়া পাইয়াছিল এবং
—আসিবার সময় যাহা মুখে আসিয়াছিল তাই বলিয়া যথেষ্ট রূঢ়
তিরস্কার করিয়াছিল। অবশ্য বলাই বাহুল্য, তাহাতে লালা কিছুমাত্র
বিচলিত হয় নাই। সে তেমনি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়াছিল।

কিন্তু সব চেয়ে বিপদ যে গুপীকে লইয়া! সে বরাবরই নির্ব্বোধ
—ইদানিং যেন জড়-ভরত হইয়া গিয়াছে। লালাটার এত বড় স্পর্দ্ধা,
গুপীকে কাছে বসাইয়া এক ছিলিম তামাক খাওয়াইয়া প্রস্তাবটা তাহার
কাছেও করিয়াছে। গুপী-ত একেবারে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া
হাজির, ভাবটা এই যে, আর কি—কাপড়ের ব্যবস্থা ত হইয়াই গেল!

কুন্তী আর সেদিন নিজেকে সাম্‌লাইতে পারে নাই, বলিয়াছিল,
'এমন বেঁচে থেকে লাভ কি তোমার! এর চেয়ে বিধবা হওয়া যে
ঢের ভাল ছিল! তোমার মুখ থেকে এই কথা শুনতে হ'ল আমায়!'

গুপী থত-মত খাইয়া গিয়াছিল। মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, 'তা—
এতে আর দোষ কি! লালা বলছিল তাই বললুম। অমনি কাপড়-
খানা পেতিস।'

'মুখে আগুন তোমার এমনি কাপড়ের! তুমি কি কিছুই বোঝ না!'

তবু গুপী বোঝে নাই। আর কুন্তীরও কেমন সঙ্কোচে বাধিয়াছিল
—সে-ও বোঝাইবার চেষ্টা করে নাই। বোধ হয় ভাবিয়াছিল যে
এসব নোংরা কথা যত না শোনে ততই ভাল, শুধু শুধু বুড়ামানুষকে
আঘাত দিয়া লাভ কি!

কিন্তু ফল হইয়াছিল তাহাতে উল্‌টা। লালার প্রতি কুন্তীর উষ্মাটা অহেতুক, তাহার একটা খেয়াল-মাত্র মনে করিয়া সে সুযোগ ও সুবিধা মত প্রত্যহই একবার করিয়া গজ গজ করিত—'আজ-কালকার দিনে একখানা কাপড়ের দাম কত!…দশ-বারো টাকায় ছোট কাপড়গুলো বিক্রী হচ্ছে।…অন্য জায়গায় পাস্ত সারা মাস বাসন মেজে—জল তুলে—বাটনা বেটে পাঁচটা টাকা। আর এখানে ক-টা দিন একটা মানুষের গা-হাত-পা টিপে দিলে যদি একখানা কাপড় পাস্ ত সে ভাগ্যি!…জানিনা যা খুশি করগে যাও—নিজেকেই একদিন ন্যাংটো হয়ে বেরোতে হবে। তোমার ভালর জন্যই বলা। তাও, লালা বলে যে, এতই যদি ওর অপমান বোধ, না হয় চুপি চুপি লুকিয়েই আসবে, কেউ না জানতে পারে তার ব্যবস্থাও করে দেবে সে।'…ইত্যাদি।

প্রত্যেকবারই কথাগুলা যেন কুন্তীর কানের মধ্যে বিছার কামড়ের মত জ্বলিতে থাকে, তবু সে আসল কথাটা গুপীকে বুঝাইয়া দিতে পারে না। লালাটাও সে কথা কেমন করিয়া বুঝিয়াছে যে, গুপীত বোঝেই না কিছু—কুন্তীও তাহার কাছে কোনদিন ভাঙ্গিতে পারিবে না। তাই সে এই সঙ্কোচের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজের আবেদনটা এম্‌নি ভাবে পাঠায়!…

একা নির্জ্জন ঘরে বসিয়াও কথাটা ভাবিতে ভাবিতে রাগে কুন্তীর দুই রগের কাছে দুইটা শিরা ফুলিয়া উঠিল, হাতটা বৃথা আক্রোশে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল।…এক এক সময় তাহার ইচ্ছা করে ঐ আঁশ বটিটা লইয়া লালা আর গুপী দুজনকেই কাটিয়া বঁটিটা নিজের গলায় বসাইয়া দেয়! শুধু বাচ্ছা দুটার মুখ চাহিয়া সব সহ্য করে!

কুন্তী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সেলায়ের সরঞ্জাম তুলিয়া ফেলিল। আর কোথাও সেলাই করা সম্ভব নয় এ কাপড়ের! এই ত কাপড়, তাও কাচিলে কিংবা চান করিলে ভিজাই গায়ে শুকাইতে হয়। কোনদিন গুপী বা খোকা না থাকিলে সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে মেলিয়া দেয়।...আজ সে গুপীকে পাঠাইয়াছে শহর হইতে ক্রোশ-দুই দূরে একটা গ্রামে—সেখানের হাটে নাকি এখন ছেঁড়া কাপড় বেচিতে আনে কোন্ এক ব্যাপারী—এই তাহার শেষ আশা, বোধ হয় সেই জন্যই, সে মনে মনে একবার জোর করিয়া বলিল,—এখানে নিশ্চয় কাপড় পাইবে গুপী। একটি টাকা তাহার হাতে ছিল, আর একটি টাকা মনিব-বাড়ী হইতে আগাম লইয়াছে—গুপীকে বলিয়া দিয়াছে দু'টাকায় যদি প্রমাণ কাপড় না পাওয়া যায়, অন্তত একখানা ছোট কাপড় যেন লইয়া আসে। যা হোক্—আধখানা কাপড় পাইলেও কুন্তীর লজ্জা নিবারণ হয়!

গুপী গিয়াছেও বহুক্ষণ, দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরই। এতক্ষণ ত তাহার আসা উচিত—কুন্তী একবার অসহিষ্ণু ভাবে বাহিরের দিকে তাকাইল। সে মনিব বাড়ী হইতে কাজ সারিয়া ফিরিয়াছে বহুক্ষণ, এখন অন্তত রাত সাড়ে-আটটা হইবে। আজ আর ভাত রাঁধিবার পাট ছিল না, ওবেলার জল দেওয়া ভাত আছে। ছেলে-মেয়েগুলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—কাজও নাই, মানুষও নাই কথা কহিবার মত, এ যেন বিশ্রী লাগে।

ডিবাটা বহুক্ষণ ধরিয়া জ্বলিতেছে, তেল বেশী নাই—হয়ত একটু পরেই নিভিয়া যাইবে, খাওয়ার সময় আর আলো মিলিবে না। কুন্তীর একবার মনে হইল আলোটা নিভাইয়া দেয়—কিন্তু একা

অন্ধকারে থাকিতে যেন সাহস হয় না। আজ কয়দিন হইতেই কেমন একটা গা ছম্‌ছম্‌ করা শুরু হইয়াছে, মনে হয় কালো দাঁত-ওয়ালা লালাটা কাছাকাছি কোথায় গা-ঢাকা দিয়া আছে, সুযোগ পাইলেই কাছে আসিবে।...তার উপর যে মেটে-বাড়ীর অন্তর্গত এই ছোট্ট চালাটায় সে আছে, সে বাড়ীর অধিবাসীরা আজ সপরিবারে কোথায় কুটুম্ববাড়ী গিয়াছে, সবটা যেন অন্ধকার থম্‌-থম্‌ করিতেছে।

দূরে কোথায় পায়ের শব্দ হইল। কুন্তী সভয়ে চমকিয়া বাহিরের দিকে চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বুঝিতে পারিল এ পদশব্দ গুপীর। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল—গুপী নিশ্চয় কাপড় আনিয়াছে, যা হোক্‌ একটা কিছু—

কিন্তু গুপী আসিল খালি হাতে। কুন্তী প্রশ্নটা পর্য্যন্ত করিতে পারিল না, শুধু আড়ষ্ট হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। ঘরে ঢুকিয়া একটু পরে গুপীই কথা কহিল, 'কাপড় পাওয়া গেল না। সবচেয়ে যা ছেঁড়া, পচা কাপড় তাই বলে সাড়ে তিন টাকা। ছোট কাপড়ও তিন টাকার কমে নেই!'

একটা হিম-শৈত্য যেন কুন্তীর শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়া নামিয়া গেল। তাহার বাহিরে যাইবার আর কোন উপায় নাই। এ ছেঁড়া ন্যাকড়াটাতে কোনমতেই লজ্জা ঢাকে না। অথচ বাহিরে না গেলেই বা চলিবে কি করিয়া। ভাত বন্ধ হইয়া যাইবে যে!

কাপড় পাওয়া যায় নাই—তবু গুপীকে যেন বেশ খুশী খুশী দেখাইতেছে। সে আবার আপনিই কথা পাড়িল, 'আমি ফিরেছি ওখান থেকে অনেকক্ষণ।'

কতকটা অন্যমনস্ক-ভাবেই কুন্তী প্রশ্ন করিল, 'তাহ'লে এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?'

'ঐ লালার ওখানে।' বলিয়া গুপী একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইল। কুন্তীর মেঘাচ্ছন্ন মুখের মধ্যে বজ্র জমিতেছে লক্ষ্য করিয়া সে প্রায় মরিয়া হইয়াই বলিয়া ফেলিল, 'কী যে তুই বুঝিস্ তা জানি না। লালার মত লোক হয় না। তুই ওর কাজে গেলে আমাকে সুদ্ধ একটা আট হাত ধুতি দেবে বলেছে। এ গামছা আর কতদিন পরি বল্‌ত!'

কুন্তী কঠিন শান্ত কণ্ঠে কহিল, 'ওর নাম তোমাকে করতে বারণ করে দিয়েছি না, কতদিন!'

'সে জানি।' গুপী প্রায় কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল, 'আমি যদি টাকা রোজগার করতে পারতুম তা হ'লে আমার কথা শুন্‌তে— আমি যে অক্ষ্যাম, আমার কথা শুনবে কেন!…ঐ অবস্থায় বাইরে গিয়ে ভারি মান-ইজ্জৎ বাড়ছে কিনা!'

'মান-ইজ্জৎ—!' কুন্তীর চোখে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। একবার সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি স্বামীর দিকে হানিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল, 'হ্যাঁ—তা বটে। মান-ইজ্জৎ রাখা দরকার।'

তারপর কেমন একটা অসংলগ্ন ভাবে হাসিয়া উঠিয়া এক রকম ছুটিয়াই ঘর লইতে সেই অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

গুপী কিছুই বুঝিল না। সে দুই এক-পা বাহিরের দিকে আগাইয়া গেল; কিন্তু স্ত্রী যে কোন্ দিকে গেল ঠাওর করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়া কপাটটা ধরিয়া দরজার কাছেই বিহ্বল ভাবে দাঁড়াইয়া

রহিল। দুঃখে কষ্টে কুন্তীর মাথাটা খারাপ হইয়া গেল কিনা—এমনি একটা দারুণ সন্দেহ তার অবসন্ন মনকে পীড়া দিতে লাগিল।

কুন্তী ফিরিল ঘণ্টাখানেক পরেই। তাহার সারা মুখে কে যেন ইতিমধ্যে কালি মাড়িয়া দিয়াছে, চোখের দৃষ্টি স্থির, উদ্‌ভ্রান্ত। সে ঘরের মধ্যে পা দিয়া দুইখানা নূতন কাপড় গুপীর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীনের মত দাঁড়াইয়া থাকিবার পরই অকস্মাৎ তাহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

গুপী ভয় পাইয়া কী যে করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। শুধু উবু হইয়া বসিয়া কুন্তীর মাথাটা দুই হাতে তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে ডাকিতে লাগিল, 'নতুন বৌ, নতুন বৌ, ছিঃ অমন করে না। অ নতুন বৌ!'

অনেকক্ষণ ধরিয়া টানাটানি করিবার পর কুন্তী মাথা তুলিল বটে কিন্তু সে যেন তখন আরও ক্ষেপিয়া গিয়াছে। হঠাৎ গুপীর হাত হইতে নতুন কাপড়খানা টানিয়া লইয়া প্রাণপণে ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকে যখন কিছুতেই ছিঁড়িতে পারিল না, তখন দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া চড়-চড় করিয়া খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'এর চেয়ে তুমি মলে না কেন, ওগো বিধবা হওয়া যে ঢের ভাল ছিল!'

তারপর আবার আছ্‌ড়াইয়া পড়িল। এতক্ষণ পরে বোধ হয় তাহার আগুন নিভিয়া আসিয়াছে, চোখে জল দেখা দিয়াছে।

গুপী এসব কিছুই বুঝিতে পারে নাই, শুধু তাহারও চোখে যেন অকারণে জল আসিয়া যায়। কুন্তীর গায়ে হাত দিবারও আর তাহার

সাহস নাই, সে মধ্যে মধ্যে অসহায় ভাবে শুধু ডাকে, 'নতুন বৌ, অ নতুন বৌ!'

অনেক, অনেকক্ষণ পরে কুন্তী উঠিয়া বসিল। চোখ মুছিয়া শান্তকণ্ঠে নূতন শাড়ীখানা গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে বলিল, 'অনেকখানি ছিঁড়ে ফেলেছি, না? আবার কাল সেলাই করতে হবে!... যাও, তুমি হাত-পা ধুয়ে এসো গে, ভাত দিই।'

গুপী তাহার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া এতক্ষণে নিজের ধুতিখানার দিকে চাহিয়া দেখিল। লালা লোক ভাল, খুব ছোট কাপড় দেয় নাই—বোধ হয় ন' হাত ধুতিই হইবে।

তৃষা

কী একটা কাজে গিয়েছিলাম চট্টগ্রামের দিকে, ফেরবার পথে ট্রেনে ভীড় দেখে মনে পড়ল সেটা শিবরাত্রির সময়! যাত্রীরা চলেছে চন্দ্রনাথে। তখনও হাতে দু'তিন দিন সময় ছিল, নেমে পড়লাম সীতাকুণ্ড স্টেশনে। চন্দ্রশেখরের দর্শন পাবো কিনা জানি না, এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সমুদ্রে জীবন-দর্শন ত হবে!

চন্দ্রনাথ বাংলার প্রধান তীর্থ, নানারকম খ্যাতি শুনে আসছি বাল্যকাল থেকে। কলিতে নাকি তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে এইখানেই। কিন্তু কী হতাশই হলুম সীতাকুণ্ডে নেমে। ছোট্ট একরত্তি গ্রাম, যেমন নোংরা তেমনি বিশৃঙ্খলা চারদিকে—আর তারই মধ্যে হাজার হাজার মানুষ এসে ঢুকেছে। ঘর-বাড়ী যেখানে যা ছিল সবই ভরে গেছে, এখন গাছতলা, বাগানও ভরে গিয়ে সকলে আশ্রয় নিতে বাধ্য

হয়েছে রাস্তায়। সেইখানেই চলেছে তাঁদের রান্না এবং নৈসর্গিক কার্য্য, প্রায় পাশাপাশি। এ বিষয়ে এত নির্বিকার যে মানুষ হ'তে পারে তা চন্দ্রনাথে যাবার আগে আমার ধারণাই ছিল না। আগের দিন রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে, আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন—সুতরাং কাদা শুকোবার সময় পায়নি। সেই চট্‌চটে কাদার সঙ্গে ভাতের ফেন এবং আর একটা পদার্থ মিলে এমন অবস্থা হয়েছে রাস্তার যে, একবার পা দিলেই স্নান করতে ইচ্ছা করে।

স্টেশনের বাইরে এসে শুক্‌নো মুখে এই জনসমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি যে বাকী দিনটা স্টেশনেই কাটিয়ে সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরব কিনা, এমন সময় একটি পাণ্ডা এসে, বলা-কওয়া নেই, একেবারে আমার হাতটা ধরে বললে, 'আসুন।'

শীর্ণ একাহারা কালো-মতন মানুষটি, সমস্ত দেহ এতই পাকানো যে বয়স আন্দাজ করা শক্ত, চল্লিশও হতে পারে প[ঞ্চা]শ হওয়াও বিচিত্র নয়। কথায় চট্টগ্রামের টান থাক্‌লেও একেবা[রে] দুর্ব্বোধ্য নয়, বোধ হয় সেটা এতদিন যাত্রী-চরানোর ফলেই একটু সহজ হয়ে এসেছে। আমি ওর মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে আছি দেখে হাতে আর একটা টান্ দিয়ে বললে, 'কৈ আসুন, আর দাঁড়াবেন না।'

আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, 'উহুঁ, আমি কোথাও যাবো না—দিনটা এইখানেই কাটিয়ে সন্ধ্যের মেল ধরব।'

সে আমার কথাটা একেবারে হেসেই উড়িয়ে দিলে। বললে, 'কী যে বলেন বাবু। চন্দ্রনাথ আপনার ওপর দয়া করেছেন, আর আপনি বলছেন 'চলে যাবো।...চলে যাবার জো কি বাবু!... কাল শিবরাত্রি, সাত-জন্মের সুকৃতি থাকলে তবে এখানে এসে

শিবরাত্রিতে বাবার দর্শন মেলে!...আসুন আসুন, মিছিমিছি দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

আমি হাতটা ওর হাতের মধ্যে থেকে টেনে নিয়ে বললুম, 'তুমি যাও, আমি যাবো না। এই নোংরামির মধ্যে আমি থাকতে পারবো না'।

'কী মুস্কিল—বাবু আমি কি আপনাকে এই নোংরামিতে থাকতে বলছি! কালীঠাকুর যখন ধরেছে তখন যাত্রী ছাড়বে না, তা তার প্রাণ যায় আর থাকে।...আপনি আমার সঙ্গে বাসায় চলুন, যদি থাকবার জায়গা ভাল না পান ত থাকতে হবে না। ট্রেন ত আপনার পালিয়ে যাচ্ছে না! আসুন—'

এই ব'লে সে আর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না ক'রে একহাতে আমার স্যুটকেশটা নিজে তুলে নিলে, আর একহাতে আমায় টানতে টানতে নিয়ে চলল তার বাসার দিকে। সত্য কথা বলতে কি এখানে নেমে মেলাটা না দেখেই চলে যাবার ইচ্ছা ঠিক আমারও ছিল না—তাই সুবোধ বালকের মতই তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলুম, অতি সন্তর্পণে কাদা বাঁচিয়ে। এত ভীড় যে তা ঠেলে ঠেলে অতি সামান্য পথও যেতে আমাদের প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগল। সেই সকাল বেলাতেই অনেক জায়গায় রান্না চেপে গেছে—ভিজে কাঠের ধোঁয়াতে পথের বাতাস ভারি—বার বার চোখ রগড়ে তবে দৃষ্টিকে কর্ম্মক্ষম রাখতে হয়। ভারতের প্রায় সব প্রদেশের লোকই এসেছে, তবে পূর্ব্ববঙ্গের ভীড়ই বেশী। সেই বিচিত্র ভাষার দুর্ব্বোধ্য কোলাহলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বার বার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলুম। কি দরকার ছিল

এর মধ্যে আসবার, অফিসের ছুটি ছিল দুদিন—ঘরে বসে ঘুমোলে কাজ দিত।

কালীঠাকুর যখন 'শেষ পর্য্যন্ত বাসায় পৌছলেন, তখন যেটুকু আশা ছিল, সেটুকুও চলে গেল। অত্যন্ত সংকীর্ণ মাটির বাড়ী, বাড়ীও নয়—তিন চার খানা ঘর জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। তাইতেই এতগুলি যাত্রী এসে আশ্রয় নিয়েছে যে, সেদিকে চাইলে মাথা ঝিম ঝিম করে। আমি বেঁকে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আগেই বলেছি যে, এর মধ্যে থাকতে পারবো না—আমাকে দয়া ক'রে স্টেশনে পৌছে দাও।'

কালীঠাকুর হাত-পা নেড়ে কি বল্‌তে যাচ্ছিল, আমি পকেট থেকে একটি টাকা বার ক'রে বল্‌লুম, 'তোমার ত টাকা নিয়ে দরকার —সে আমি এম্‌নিই দিচ্ছি।'

অনেকখানি জিভ্‌ কেটে কালীঠাকুর বললে অত অর্থপিশাচ আমি নয় বাবু, তা'হলে এতদিনে পাকা বাড়াই করতুম। যখন এনেছি তখন আপনার চিন্তা নেই। আপনি আমার ঘরে থাকবেন। তাহ'লেই ত হ'ল !'

এই বলে সে আবার আমার হাত ধরে টানতে টানতে মাঝের বড় কুঠুরিটায় নিয়ে গেল। তারও বাইরের রকে অসংখ্য যাত্রী গাদাগাদি ক'রে পড়ে রয়েছে। আর তাদেরই অনবরত আনাগোনার ফলে সমস্ত ঘরের মেঝেটা রাস্তার কাদায় চট-চট করছে। তবে একটা সান্ত্বনা এই যে, ঘরের মধ্যে ভীড়টা নেই, এতক্ষণে একটু নিঃশ্বাস ফেলবার মত অবকাশ মিলল।

ভেতরে পা দিয়ে বুঝলুম সত্যিই এটা ঠাকুরের নিজের কুঠুরি।

বিরাট ঘর, মাঝখানে সাবেক কালের একখানা বড় খাট পাতা, এক পাশে চৌকির ওপর অনেকগুলো, প্রায় আট-দশটা পুরানো ট্রাঙ্ক গাদাগাদি করে রাখা, এমন কি এক পাশে একটা নড়বড়ে কাঠের আলমারিও আছে। আলনা, বাসনের চৌকী, কিছুরই অভাব নেই।

খাটটা বড় বটে কিন্তু তার ওপরে যে বিছানাটি ছিল তার বর্ণনা না করাই ভাল। কালী ঠাকুর এক টান মেরে বালিশগুলো কাদার ওপর নামিয়ে দিলে, বাকী যা রইল তার ওপর আমার বিছানাটা বিছিয়ে দিয়ে বললে, 'নিন্ এবার জুতো খুলে ভাল হয়ে বসুন। কাদায় নামবার দরকার কি?…আমি আপনার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ঠাকুর চলে যেতে আমি তাঁর উপদেশ-মত বিছানায় উঠে বসলাম। স্টেশনেই মুখ হাত ধুয়ে এসেছিলাম। কম্বলটা জড়িয়ে নিয়ে আরাম করে বালিশ ঠেস্ দিয়ে বস্‌লাম, যা হবার হোক্—আমি আর নড়ছিনে।

চুপ করেই বসে আছি। অকস্মাৎ জনহীন ঘরে মানুষের গলার আওয়াজের মত কি একটা শুনে চমকে উঠলাম। ভাল করে চেয়ে দেখি আর একটি প্রাণীও সে ঘরে আছে—এতক্ষণ দেখতে পাইনি। একেবারে একটা কোণে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে বসে রয়েছে একটি কঙ্কালসার বৃদ্ধা। তার সামনে একটা মালসাতে আগুন, সেটাকে প্রায় গায়ের ওপর টেনে নিয়ে উবু হয়ে বসে আগুন পোয়াচ্ছে। বুড়ীটা সধবা, লালপাড় কাপড় এবং শাঁখা দেখে অন্তত তাই মনে হয়।

কিন্তু এত রোগা যে মানুষ হ'তে পারে তা এ মূর্ত্তি না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

অবাক্ হয়ে চেয়ে আছি, বুড়ীটা কি একটা অস্পষ্ট শব্দ করল। আমার দিকেই চেয়ে আছে দেখে বুঝলুম, আমাকেই কি বলতে চায়। কিন্তু তার সে ক্ষীণ আওয়াজ অতদূর পৌছোনো সম্ভব নয়। নেমে গিয়ে শুনবো কি না ভাবছি এমন সময় কালীঠাকুরের গলা পেয়ে মনটা সেই দিকে চলে গেল। কালীঠাকুর আর একটি মেয়েছেলের সঙ্গে উত্তেজিত কণ্ঠে কি তক্‌রার করছে। ভাষা প্রায় দুর্ব্বোধ্য, অনেকক্ষণ কান পেতে শুনে বুঝলুম, ঝগড়াটা চলছে আমাকে নিয়েই। গৃহিণী বলছেন, 'তোমার একটা আক্কেল নেই! নিজেদের ঘরটা সুদ্ধ ছেড়ে দিলে, এখন ছেলেপুলে নিয়ে যাই কোথা!…জল, কাদা, ঠাণ্ডা—কিছু ভাবলে না, পয়সাটাই সব হ'ল!'

কালী চাপা গলায় জবাব দিচ্ছে, 'আরে মাগী পয়সার জন্মে কি, ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ আশ্রয় না পেয়ে ফিরে যেতেন সেইটে ভাল হ'ত?… তুই অত ভাবছিস কেন, ওপরের চোরা কুঠুরীটা আমি পরিষ্কার ক'রে নিচ্ছি—ঘুঁটেগুলো সরিয়ে—

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ব্রাহ্মণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'হ্যা, ঐ ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়, তার ওপর কাঠ ঘুঁটে রেখে রেখে সাপের বাসা হয়ে আছে, ওখানে আমি ছেলেপুলে নিয়ে গিয়ে ঢুকছি! থাকতে হয় তুমি থেকো।'

আমার কি অবস্থা বুঝতেই পারছেন। মানে মানে সরে পড়ব কিনা ভাবছি, এমন সময় প্রশান্তমুখে কালীঠাকুর ঢুকলো একটা কাঁসার গেলাসে চা আর দুটো মিষ্টি নিয়ে।

'নিন্ বাবু, খেয়ে নিন্—'

আমি চায়ের গেলাসটা হাত থেকে নিয়ে সবে বলতে যাচ্ছি, 'সত্যিই এ বড় অন্যায়, আমি না হয় ঐ বাইরে কোথাও—'

বাধা দিয়ে কালী ঠাকুর বললে, 'ক্ষেপেছেন!' আমি মানুষ চিনি না? আপনি কখনও ঐসব ইতর লোকেদের সঙ্গে থাকতে পারেন?… মাগীর কথা কানে গেছে বুঝি? ও অমন বলে। মেয়েদের কথায় কান দিলে সংসার চলে? কিছু না, ওসব টিট করতেও জানি, তবে দ্বিতীয় পক্ষ কি না, একটু সমীহ ক'রে চলতে হয়।'

কৌতূহল হ'ল, কৌতুকও বোধ করলুম। বললুম 'দ্বিতীয় পক্ষ বুঝি?…কতদিন করেছেন?'

'তাও হ'ল বাবু, কম দিন নয়। বছর বারো।…দেখুন না, একটি বড় সড় মেয়ে পেয়েছিলুম তা ঐ বড় ঠাকরুণটির জন্যে হ'ল না। কান্না-কাটি করে এক কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌ল। বলে বাইরে থেকে সতীন আন্‌লে আমাকে সে খুন করে ফেলবে। তার চেয়ে আমার বোনকে বিয়ে করো, হাজার হোক মায়ের পেটের বোন ফেলতে পারবে না।… সেই জন্যই ত ঐ বারো বছরের খুকীকে বিয়ে করতে হ'ল—আর সেই থেকে আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে বাবু! এই বয়সে কি পোষায় ছুঁড়ীর মন জোগানো—'

অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম—ওর কথায় নয়, 'বড়-ঠাকরুণ' কথাটা উচ্চারণ করবার সময় যেদিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছিল, সেইদিকে চেয়ে। ঐ কঙ্কালসার মুমূর্ষু বৃদ্ধা—ঐ—

আমি অতি কষ্টে শুধু বললুম, 'উনিই তাহলে আপনার—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, উনিই আমার প্রথম পক্ষ।'…

আমার বিস্ময় তখনও কাটে নি, আমি বললুম, 'কিন্তু ওঁকে দেখলে ত—'

'অনেক বয়স মনে হয়, না বাবু?'.

কালী হেসে বললে, 'কিন্তু তা নয়, বয়স বোধ হয় চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বেশী হবে না। রোগে রোগে অমনি হয়ে গেছে।…নানান্‌খানা রোগ কি না।'

তারপর হঠাৎ আমার পাশে বসে পড়ে গলার স্বর নামিয়ে বললে, 'অমন ছিল না বাবু, বেশ চেহারা ছিল। ছেলেপুলে হল না বলেই আবার বিয়ে করা।…কিন্তু সেই আমার বিয়ের পর থেকেই যে কী হল, খালি খিটূ খিটূ করে আর রোগে ভোগে। এখন ত ঐ দেখছেন, মানুষের বার হয়ে গেছে একেবারে!…বলে, কি জানেন? বলে ছুটকি নাকি ওকে কি সব ওষুধ বিষুধ খাইয়ে ঐরকম করে দিয়েছে।……বলাও যায় না বাবু, কি বলেন? মেয়েরা সব পারে। বোনই হোক্‌ আর যাই হোক্‌—ওদের অসাধ্য কাজ নেই। নইলে—'

আরও কি বলতে গিয়ে সহসা ঠাকুর থেমে গেল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি দোরের বাইরে থেকে একটি বছর পঁচিশের শ্যামাঙ্গী মেয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সে চাউনির দিকে চেয়ে আমারই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল—কালী ত কাঠ!

মেয়েটি কিন্তু কিছুমাত্র সমীহ করলে না। মাথার কাপড়টা আর একটুখানি মাত্র টেনে দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল, তারপর আমাকে উদ্দেশ করেই বললে, 'আমার নিন্দে করছিল ত বাবু? ফাঁক পেলেই আমাকে গাল দেয় জানি। বুড়ো ড্যাক্‌রাকে ঐ অলপ্পেয়ে মাগী

গুণ করেছে—আমাকে তুটি চোখে দেখতে পারে না! মর্ মর্ তোরা তুজনেই মর্—হাড় জুড়োয় আমার। ছেলেমেয়ের হাত ধরে রাস্তায় বসে ভিক্ষে করব সে আমার ঢের ভাল।'

সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে আর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি কালী ঠাকুরের দিকে হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলা বাহুল্য এর পরে আর কালীর গল্প করার উৎসাহ রইল না—সে-ও শুকনো মুখে ওর পিছন নিল। তুপুরবেলা আমার ভাত ঘরেই এসে পৌছল। আমি খেতে বসেছি, আর একটা বড় পাথরের থালা করে ছোট গিন্নী একথালা ভাত তরকারী এনে ওর দিদির সামনে বসিয়ে দিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'নাও গেলো!…হ'ল? ভাত ভাত—সারাদিনই ভাত চাই ওর!'

বুড়ী তার ক্ষীণকণ্ঠে কি একটা বললে শুনতে পেলুম না কিন্তু ছোঠ বৌ আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'যা পেয়েছিস তাই খা আগে!… বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার পেটে ঢোকালেও তোমার খাই খাই মিটবে না। মুখে আগুন—মরেও মরে না, খালি জ্বালায় আমাকে! দেখুন না বাবু, খেতে পারে না, খেলেও হজম হয় না—অথচ দিনরাত খাই খাই ছাড়া অন্য কথা নেই। খালি খাবে আর বুকের কাছে আগুন নিয়ে বসে থাকবে।…আমিই সব করব—খাওয়াবো, নাওয়াবো ময়লা পরিষ্কার করব—আর আমার ছেলেমেয়েদেরই গাল দেবে!—চেয়ে আছে দেখো না, ডাইনী! ইচ্ছে হয় চোখ তুটো গেলে দিই একেবারে—'

অকস্মাৎ ছোট বৌ-এর চোখ তুটো যেন হিংস্র হয়ে উঠল। সে বোধ হয় আরও কি বলতে যাচ্ছিল, আমার দিকে চোখ পড়তেই সামলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বুড়ী সত্যিই খেতে পারলে না। আপন মনে বিড়-বিড় ক'রে কি বক্‌তে বক্‌তে অনেকক্ষণ ধরে ভাত তরকারী নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করলে। আমি খেয়ে ঘুমোবার উদ্যোগ করছি এমন সময় কালী ঠাকুর নিজে এসে সেই থালার ওপরই ওর হাত-মুখ ধুইয়ে বাসন নিয়ে চলে গেল। তারই ভেতর লক্ষ্য করলুম, কাতরকণ্ঠে বুড়ী ওকে কি বলছে। বুড়ীর দুই চোখের কোল বেয়ে বোধহয় দু-এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল, বুঝলাম যে এ হ'ল নিত্যকার ঘটনা, এ চোখের জলে বিচলিত হওয়া উচিত নয়।

শুয়ে একটু চোখ বুজেছি, বোধ হয় তন্দ্রাও এসেছে—হঠাৎ কানের কাছে কি একটা শব্দ শুনে চমকে চোখ চেয়ে দেখি বুড়ী কখন হামা দিয়ে আমার খাটের কাছে এসেছে, অদ্ভুত একটা শব্দ করে ডাকছে, 'বাবু বাবু!'

ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নি, বিরক্ত হবারই কথা, তার ওপর এত কাছে ঐ বীভৎস মূর্ত্তি দেখে একটু চমকেও উঠেছিলুম। ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বললুম, 'কী, চাই কী?'

সে যা বললে অতিকষ্টে তার সার উদ্ধার করলুম। বললে, 'বাবু আমাকে খেতে দেয় না হতভাগী ভাল করে, তার ওপর দিনরাত গালাগাল দেয়—আপনি বলে দেবেন ওকে একটু?...আমার ঘর, আমার বাড়ী বাবু, আমারই স্বামী, আমি নিজে হাতে করে তুলে ওকে দিলুম—ও আমার কি হাল করে রেখেছে দেখুন।'

ঐ ক-টা কথা বলেই বুড়ী যেন হাঁপাচ্ছিল। শীর্ণ শুষ্ক গাল বেয়ে দু ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল। একটু দম নিয়ে আবার বললে, 'পাছে উনি আমার কথা শোনেন, তাই বিষ খাইয়ে আমার এমন

চেহারা করে দিয়েছে। আমি এমন ছিলুম না।···ওর চেয়ে ঢের সুন্দর ছিলুম। আমারই খাটে আমার স্বামী নিয়ে শোয়, আমি ঐ বাইরের রকে পড়ে থাকি।···আমার সব কেড়ে নিয়েছে ঐ হারামজাদী, ওর গায়ে যে সব গয়না দেখছেন, ও কার? আমার।··· আমারই সামনে ঐ সব গয়না পরে বুড়ো বরের মন ভোলায়— লজ্জাও করে না!'

তারপর গলা আরও নামিয়ে এনে বললে, 'আমাকে মোটে কিছু খেতে দেয় না বাবু, শুধু দুবেলা দুমুঠো ভাত। তাও দেয় না; এক একদিন রাগ করে ছাই মিশিয়ে দেয়। বলুন ত বাবু, কি করে বাঁচব এমন করলে?'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে সে বিষম হাঁপাতে লাগল। বোধ হয় আরও কি সব বললে কিন্তু গলা দিয়ে ভাল করে স্বর বেরোল না। তখন একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, 'ও হারামজাদীকে নয়, আমাদের একে একটু বলে দেবেন বাবু? আপনি বললে শুনবে— আমাকে যেন একটা গয়না দেয়। অন্তত আমার বালাটা দিক্, একে ত এই চেহারার ছিরি—একটা কিছু গয়না না পরলে কি বিশ্রী দেখায় বলুন ত!···সব নিয়ে রেখেছে ঐ লক্ষীছাড়ি—সব, আমার এক-গা গয়না ছিল বাবু!'

এখনও গয়না পরার এবং ভাল দেখাবার সখ্ দেখে আমার হাসি পায়। কিন্তু বুড়ীর কোটরগত চোখ দুটি বলতে বলতে যেন জ্বলে উঠল। সে সাপের মত হিস্-হিস্ করে বললে, 'ডাইনী, ডাইনী! আমাকে বিষ খাইয়েছে তাতেও মন ওঠে নি, স্বামীকে সুদ্ধ গুণ করেছে! হে মা মেহার কালী, ছুঁড়ীকে নাও মা, বুক চিরে রক্ত দেব—'

আমি একটা ধমক দিয়ে উঠলুম। বললুম, 'ওসব কি হচ্ছে কি? যাও, ওখানে গিয়ে ব'সো গে—'

কণ্ঠস্বর ওর আর একবার করুণ হয়ে এল, বললে, 'বড্ড ক্ষিদে পায় বাবু, আমার রোজ দুধ খাওয়া অভ্যেস ছিল, একটুও দুধ দেয় না—দেবেন বাবু আমাকে চার পয়সার মিষ্টি এনে? আমার বড্ড খেতে ইচ্ছে করে।'

আমি তাকে একটা আশ্বাস দিতে যাচ্ছি, কালী ঠাকুর কোথা থেকে এসে পড়ল। ওকে ঐ অবস্থায় দেখে কী যেন একটা ভয়ে ওর মুখ গেল বিবর্ণ হয়ে। সে কাছে এসে চাপা গলায় বললে, 'বড় বৌ, ও বড় বৌ, এখানে কেন এসেছ। যাও, যাও, ওঠো—।'

বলে সে আর উত্তরের অপেক্ষা-মাত্র না করে নিজেই তাকে প্রায় কোলে করে তুলে নিয়ে গিয়ে আবার সেই কোণে বসিয়ে দিলে। ঠিক করে বসিয়ে আগুনের গামলাটা টেনে দিচ্ছে এমন সময় ছোট বৌ হঠাৎ কোথা থেকে এসে ঢুকল। স্বামীকে দিদির কাছে দেখেই সে একেবারে সপ্তমে চড়ে উঠে বললে, 'আবার এসেছ এখানে গুজ্‌গুজ্ করতে! মাগভাতারে পরামর্শ করে কি করবে আমাকে? বিষ খাওয়াবে? তাই না হয় খাওয়াও! লজ্জাও করে না তোর বুড়ী, ঐ ত পেত্নীর মত চেহারা! এখনও ভাতারকে ভোলাতে চাস?'

কালী ঠাকুর যেন ভয়ে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাছে এসে ছোট বউ-এর মুখে হাত চাপা দেবার ভঙ্গী করে বললে, 'কী করিস ছোট বৌ, বাবু মশায় আছেন দেখতে পাচ্ছিস না?'

'বাবু মশায় আছেন ত কি? আমার মাথা কিনেছেন আর কি? দ্যাখো, আমিও সাবধান করে দিচ্ছি, এই ফুরসুতে তুমিও যে যা খুশী

করবে তা চলবে না। তোমার দাঁত আমি তা হ'লে একটি একটি করে নোড়া দিয়ে ভাঙব ! আর ঐ বুড়ী, ওর গালে যদি আমি জ্যান্তে না নুড়ো জ্বেলে দিই ত কি বলেছি !'

কালী ঠাকুর এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।...কিন্তু বড় বৌ ছাড়বার পাত্রী নয়, সেই অবস্থাতেই কোণ থেকে গজরাতে লাগল। তার কথা শোনা গেল না, শুধু একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ পেলাম মাত্র !

সন্ধ্যায় বেড়িয়ে ফেরবার পথে বুড়ীর কথা মনে পড়ল। দুটো মোণ্ডা কিনে পকেটে করে নিয়ে এলাম। ছোট বৌ-এর যা নমুনা পেয়েছি তাতে তার সামনে দিলে আর খেতে পাবে না—লুকিয়ে দিতে হবে। অবশ্য সে সুযোগের বিশেষ অভাব ঘটল না, ছোট বৌ তখন রান্না আর ছেলে-মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত, কালী ঠাকুর সন্ধ্যের ট্রেণে যাত্রী ধরতে গিয়েছে—বাইরে এমন কোলাহল যে ঘরের কোন কথাই বাইরে পৌঁছবার সম্ভাবনা নেই। ঘরে ঢুকে পাতাসুদ্ধ মিষ্টিটা ওর সামনে রেখে বললুম, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো—বোন আসবার আগে।'

ও আগুনের ওপর হাত দুটো মেলে কি বিড় বিড় করে বকছিল, তাড়াতাড়ি মিষ্টিটা পাতাসুদ্ধ তুলে কোলের কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেললে। আশায়, লোভে ওর প্রেতিনীর মত মুখও উজ্জল হয়ে উঠল। আমি চলে আসছি দেখে আমার কোঁচার কাপড়টা কম্পিত হাতে চেপে ধরে বললে, 'বাবু আমার গয়নার কথা বলেছিলেন ? বালা-জোড়াটার কথা ?'

'আচ্ছা সে হবে, হবে।' বলে নিজের বিছানায় এসে বসলুম।

রাতটা পোহালে বাঁচি। কাল দর্শন ক'রে এসেই স্টেশনের পথ ধরব।...

রাত্রেও যথারীতি এক সময়ে ছোট বৌ বুড়ীটাকে ভাতডাল ধরে দিয়ে গেল—বুড়ী কিছুই খেলে না প্রায়, মেঝে ছড়িয়ে ফেলে দিলে। ছোট বৌ-এর ঝঙ্কারে তা বুঝতে পারলুম, যদিও পরিষ্কার করলে কালী ঠাকুর নিজে।...

আমি আহারাদির পরই শুয়ে পড়লুম। এখানে জেগে থাকাই অসম্ভব, সুস্থ মানুষও পাগল হয়ে যায়। যতটা সময় ঘুমিয়ে কাটানো যায় ততই ভালো। ঠাকুর মশায়রা কোথায় শুলেন জানি না—হয়ত বা ওপরের কুঠরীতেই আশ্রয় নিলেন শেষ পর্য্যন্ত।

পরের দিনই শিবরাত্রি, ভোর বেলা থেকে যাত্রীদের গুঞ্জনে ঘুম ভেঙ্গে গেল—কিন্তু ঘড়িতে দেখলুম সবে রাত পাঁচটা, এত ভোরে উঠে কি করব? লেপ জড়িয়ে পড়ে আবার খানিকটা ঘুমোবার চেষ্টা করছি অকস্মাৎ ছোট বৌ-এর বিকট চিৎকার কানে এসে পৌছল। যেন কেউ খুন করলে তাকে—বা ঐ রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটল—এমনি গলার তীব্রতা। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে টর্চ্চ হাতে করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ব্যাপার কি?

ছোট বৌ তার রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে তখন, আমাকে দেখে গলা আরও বাড়িয়ে দিলে, 'আপনারা ত আমার দোষ দেন, দেখুন দেখি এসে কাণ্ডখানা। ওকে যদি আজ খুন না করি ত কি বলেছি।...ছি, ছি, তুমি যাই পুরুষ তাই ঐ পেত্নীকে ঘরে পুষে রাখো, আমি হলে রাতারাতি মাটিতে পুঁতে ফেলতুম।'

ব্যাপারটা কি জানবার জন্ত এগিয়ে গেলুম। কালী ঠাকুর নত-

মুখে অপরাধীর মত দাঁড়িয়েছিল, আমাকে আসতে দেখে সরে দাঁড়াল। কাছে গিয়ে দেখি বড়বৌ কখন রাত্রি-বেলা দোর খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, তারপর রান্নাঘরের আগড় খুলে হাঁড়ী থেকে ভিজে ভাত, তরকারী সব পেড়ে, মেঝেময় ছড়িয়ে সমস্ত গায়ে মেখে, সেই মাটির ওপর পড়েই অগাধে ঘুমোচ্ছে। আমার দেওয়া সেই মোণ্ডা-দুটোও একপাশে পড়ে রয়েছে।

ভোগের যে দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা তাকে এই দেহে এতখানি অমানুষিক শক্তি দিয়েছি, তারই এই প্রচণ্ড প্রকাশের সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সভাপতি

গ্রাম নয়, অথচ ঠিক শহরও নয়—বরং গণ্ডগ্রাম বলা যেতে পারে। যদিচ শহর নামেই জায়গাটি পরিচিত।

পশ্চিম-বঙ্গের এম্‌নি একটি স্থানে সেদিন হঠাৎ একটু বেশী রকমের সাড়া পড়ে গেল। হৈ-চৈ গণ্ডগোলের অবধি নেই, সকলের চোখে-মুখেই একটা উদ্যোগ-আয়োজনের চেহারা, একটা প্রতীক্ষার চিহ্ন। মফস্বলের এক অতি ক্ষুদ্র শহরের স্তিমিত জীবনযাত্রার মধ্যে বহুকাল পরে কী যেন জোয়ার এসেছে—তারই সাড়া জেগেছে তার বৈচিত্র্যহীন দিনরাত্রির কূলে কূলে। সকলের সেই মিলিত কোলাহলের মধ্যে একটি বাণীর আভাসই মাত্র পাওয়া যায়—'আসবে, আসবে!'

অবশ্য ব্যাপারটা একটু নাটক ক'রেই বলা হ'ল—আসল কথাটা হচ্ছে বিখ্যাত জননায়ক ও দেশসেবী শান্তিরঞ্জন বাবু আসছেন আজ

এখানে। এ শহরে বহুকাল থেকেই একটি হাইস্কুল আছে, কিন্তু কলেজ ছিল না। এখানকার ছেলেদের কলেজে পড়তে হ'লেই পাশের একটি শহরে যেতে হত। এঁবার অনেক চেষ্টায় ঐ ইস্কুলের সঙ্গেই একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ খোলবার অনুমতি পাওয়া গেছে—সেই কলেজের আজ উদ্বোধন, আর সেই উপলক্ষ্যেই শান্তি-রঞ্জন বাবু আসছেন এখানে। তিনি কলেজ উদ্বোধন করবেন আজ অপরাহ্ণে, কাল সকালে এখানকার একটি লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব ক'রে একেবারে কাল বিকেলের ট্রেণে কল্‌কাতায় ফিরবেন। অর্থাৎ পুরো ছাব্বিশটি ঘণ্টা তিনি থাকবেন এখানে!

এ বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়—বিশেষ এই ছোট্ট শহরের পক্ষে! কারণ শান্তিরঞ্জন বাবু বড় ব্যবহারজীবী, কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বার-দুই জেলও খেটেছেন; তাছাড়া তিনি ধনী, তিনি পণ্ডিত। অর্থ-শাস্ত্র ও রাজনীতির ওপর তাঁর দু-[illegible]খানি বই আছে, কোন কোন কলেজে তা পড়ানো হয়। তিনি য়্যাসেম্ব্লির মেম্বার—অদূর ভবিষ্যতে যদি সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হয় তাহ'লে সেখানেও তাঁর একটা মূল্যবান্ দপ্তর পাবার সম্ভাবনা আছে। এ-হেন একটি পুরাদস্তুর নেতা এসব স্থানে আসেন কদাচিৎ—কাজেই হৈ-চৈ একটু হবে বৈকি!

ছেলেদের ত আহার-নিদ্রা নেই, বৃদ্ধদেরও তথৈবচ। কলেজের বাড়ীটি কেমন ক'রে সাজানো হবে এ নিয়ে একদল হবু-অধ্যাপক এবং ছাত্রদের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। যাহোক, সেটা সকালের মধ্যেই শেষ করা হ'ল তাড়াহুড়ো ক'রে। আর একটা সমস্যা ছিল

মাননীয় অতিথি এবং তাঁর সেক্রেটারী কোথায় থাকবেন। এঁরা অর্থাৎ কলেজের কর্তৃপক্ষ স্থির ক'রে রেখেছিলেন ডাকবাংলা, কিন্তু স্থানীয় এক রাজাবাহাদুর তাতে খুব উষ্মাপ্রকাশ ক'রে জানিয়েছেন যে, যদি শান্তিবাবু তাঁর বাড়ীতে না ওঠেন তাহ'লে কলেজের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকবে না—কোন রকম অর্থ-সাহায্য আর কলেজওয়ালারা যেন তাঁর কাছে আশা না করে!

অতএব সেই ব্যবস্থাই ঠিক হ'ল। এক জমিদারের বাড়ী আজ অপরাহ্নে চা খাবেন, আর এখানকার এক স্থানীয় কংগ্রেসী নেতা—জনৈক উকিলের বাড়ী কাল সকালে জলযোগ করবেন, এ নিমন্ত্রণ নাকি টেলিগ্রাফ ক'রে তাঁকে জানান হয়েছে। অর্থাৎ এদিকটা এক রকম সবাই নিশ্চিন্ত। তবু তাড়াহুড়োর অবধি নেই। যে ছেলেটির ওপর সভাপতির মালা ঠিক ক'রে রাখার ভার দেওয়া হয়েছে, সে-ত পুরো দু-টি রাত্রি ঘুমোতেই পারেনি দুশ্চিন্তায়!

যাই হোক্—শেষ পর্য্যন্ত শান্তিরঞ্জন বাবু এসে পৌঁছলেন। তিনি এবং তাঁর তরুণ সেক্রেটারী। স্টেশনে বিপুল জনতা গিয়েছিল তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য—কত প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে যে তাঁকে ফুলের মালা পরানো হ'ল তার হিসেব তাঁর সেক্রেটারী অজিতের পক্ষেও রাখা কঠিন হ'য়ে পড়ল। এমন কি স্থানীয় মুসলিম-লীগের কর্তৃপক্ষও তাঁকে অভ্যর্থনা ও নিমন্ত্রণ জানাবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন।

সেই ভীড়ের মধ্যে ফুলের মালা ও দেঁতো হাসিতে অভ্যস্ত শান্তি-রঞ্জন বাবুও যেন ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলেন। এ যেন ফুরোয় না। অভ্যর্থনার চাপে অতিথির অবস্থা যে করুণ হয়ে উঠতে পারে

সেদিকে কারুরই দৃষ্টি নেই। ট্রেণ থেকে নেমে স্টেশনের গেট পর্য্যন্ত আস্‌তেই আধঘণ্টা সময় লেগে গেল, গতি এমনই মন্থর, জনতার ব্যবস্থা এতই শৃঙ্খলাহীন!

শান্তিরঞ্জন বাবু এক-পা এক-পা ক'রে এগোন আর শ্রান্ত অসহায়-ভাবে চারিদিকে তাকান। সবাই অপরিচিত—কোন চোখে কোন পরিচিতির আলো নেই। কী যে এরা বলছে সেদিকে তাঁর কান ছিল না, কারণ এ সব কথা তিনি সর্ব্বত্রই শোনেন। আজ তাঁর মন অন্য অনেক কারণে উত্যক্ত ছিল—আসবার সময় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একটু বেশী রকম মনোমালিন্য হয়ে গেছে, সারা পথ মনে মনে সেই সব কথাই তোলাপাড়া করেছেন, এখন যেন মন চাইছে সহসা কোন পরিচিত বন্ধুর মুখ। যার সঙ্গে রাজনীতি নয়, সমাজনীতি নয়, স্বার্থ নয়—দুটো সুখদুঃখের গল্প করা যায়। একবার ভীড়ের মধ্যে একটি লোককে যেন তাঁর পরিচিত বলে মনে হ'ল, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারলেন না তাকে কোথায় দেখেছেন। সেও কাছে এল না, একবার মাত্র মুখ তুলে দূর থেকে ওঁকে ভাল করে দেখেই ভীড়ের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। তরুণ মুখ, যদিও চুল অধিকাংশই পাকা-পাকা—চোখের দৃষ্টি বড় সুন্দর, বড় পরিচিত। সেদিকে চেয়ে মনে হ'ল যেন কত কী পুরোনো কথা ভীড় করে স্মৃতির সঙ্কীর্ণ পথে আসতে চাইছে—যদিও শেষ পর্য্যন্ত তা চারিদিকের কোলাহলে ঝাপ্‌সাই হয়ে রইল, নীহারিকা থেকে কোন নক্ষত্রের জন্ম হ'ল না।

অবশেষে এক সময়ে স্টেশনের বাইরে এসে ওঁরা গাড়ীতে উঠলেন। রাজবাড়ীতে গিয়ে মালপত্র রাখা হ'ল; সেখান থেকে চায়ের নিমন্ত্রণ সেরে ওঁরা যথাসময়ে উপস্থিত হ'লেন, কলেজ-সংলগ্ন সভামণ্ডপে।

এতক্ষণে শান্তিরঞ্জনবাবু অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছেন। যুদ্ধের ঘোড়া যেমন রণবাদ্য শুনলে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, সন্ন্যাসীরা যেমন চড়কের বাদ্যে উৎফুল্ল হয়—শান্তিরঞ্জনবাবুর মনও দীর্ঘদিনের অভ্যাস-মত সভা-মণ্ডপে ঢুকেই আসন্ন বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে। আজও তার অন্যথা হল না, বহুক্ষণ ধরে আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করলেন—দেশের যুবসঙ্ঘকে কর্ম্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে বললেন, সরকারকে গাল দিলেন, ভণ্ডদের তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করলেন। তাঁর চোখা বক্তৃতা শুনতে শুনতে সকলেরই মনে হ'ল—হ্যাঁ, আয়োজন সার্থক হয়েছে, এতগুলি ফুলের মালা এবং অভিনন্দন অপাত্রে বর্ষিত হয়নি।

ওঁর বক্তৃতার পর আরও কয়েকটি বক্তৃতা ছিল। সে যেন জয়-ঢাকের পর হাততালির শব্দ; তবু সেগুলিও হওয়া চাই, যার যা বক্তব্য তৈরী ছিল তা বলতে দিতে হবে বৈ কি! শান্তিরঞ্জনবাবু দীর্ঘ বক্তৃতার পর বসে বিশ্রাম করছেন আর এই সব বক্তৃতায় মন দেবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় ভীড় ঠেলে একটি বেঁটে-মত ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন সভাপতির দিকে। কাছাকাছি এসে কিন্তু ঠিক ওঁকে সম্বোধন করবার মত সাহসে কুলোলনা, হাসি-হাসি মুখে শান্তিবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

শান্তিবাবু প্রথমটা শূন্য দৃষ্টিতেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর তাঁর ভ্রূ গেল কুঁচকে—আর একটু পরেই অকস্মাৎ তাঁর চোখ-মুখ পরিচয়ের দীপ্তিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল, সভার মর্য্যাদা ভুলে গিয়েই বলে উঠলেন, 'আরে, অনাদি না?'

হ্যাঁ। অনাদিই বটে। কোন ভুল নেই। ঐ ত কৃতার্থ অনাদির মুখ গর্ব্বে ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, পসার ও প্রতিপত্তি দুই-ই যে

তাঁর বাড়ল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি আর একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'চিন্‌তে পেরেছ তাহ'লে।'

শান্তিরঞ্জন বাবু হেসে, একটু চুপি-চুপি কথা কইবার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'বিলক্ষণ, না চিনতে পারার মত কী হ'ল আবার!...এস, এস, সত্যি কথা বল্‌তে কি এসে পর্য্যন্ত একটা বন্ধু-বান্ধব বা চেনা লোকের মুখ দেখতে না পেয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। ব'স, ব'স!'

পাশেই বসেছিলেন কলেজের হবু ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল—তিনি সসম্ভ্রমে অনাদিবাবুকে চেয়ার ছেড়ে দিলেন। অনাদিবাবুও সগর্ব্বে একবার চারিদিকে তাকিয়ে তাঁর এই সহসা-প্রাপ্য সম্মান গ্রহণ করলেন, অর্থাৎ সেই খালি চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলেন।

অনাদিবাবুও উকীল। খুব নাম করা নয়, তবে সংসার ভালোই চলে তাঁর ওকালতির উপার্জ্জনে। তিনি শান্তিরঞ্জনবাবুর সতীর্থ। বি-এ পড়েছেন তাঁরা একসঙ্গে—একই সঙ্গে আইন পাশ করেছেন, এক কলেজ থেকেই। আইন পড়তে পড়তে দু'জনেই এম্-এ পড়তে যান, শান্তিবাবু পাশ করেন, অনাদিবাবু সিক্‌স্‌থ্ ইয়ারে উঠে ছেড়ে দেন। সুতরাং তাঁরা বন্ধুত্বের দাবী করতে পারেন অনায়াসে।

সভায় ফাঁকে-ফাঁকেই চল্‌ল খুচ্‌রো আলাপ। অনাদিবাবুর পারিবারিক সংবাদ সব শুনলেন শান্তিরঞ্জনবাবু। শান্তিরঞ্জনবাবুরও ছেলেমেয়ের খবর নিলেন অনাদিবাবু। বললেন, 'এক একবার ভাবি যে একখানা চিঠি লিখ্‌ব কিন্তু সাহসে আর কুলোয় না। তুমি এখন এত বড় হয়েছ, এতকাল—কী জানি যদি চিন্‌তে না পারো! কিংবা চিঠির উত্তর দেবার সময় না পাও।'

শান্তিরঞ্জনবাবু বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, শেষেরটাই সম্ভব।

চিন্‌তে পারতুম ঠিকই কিন্তু উত্তর দেওয়া হয়ে উঠ্‌ত কিনা সন্দেহ। ভোর সাড়ে ছ'টা থেকে রাত দেড়টা-দুটো পর্য্যন্ত নিঃশ্বেস ফেলবার সময় পাই না। বন্ধুবান্ধবদের চিঠি ত আর সেক্রেটারীর মারফৎ দেওয়া যায় না!...বড্ড অসামাজিক হয়ে উঠ্‌তে হয়েছে ভাই, এত রকমের মানুষ এত কাজ নিয়ে আসে, এক এক সময় ভারি বিরক্তি বোধ হয়। এই যে দু'টো এন্‌গেজমেণ্ট নিয়েছি কতকটা রাগ করেই। তবু এখানে একটু বিশ্রাম করতে পারব। অন্ততঃ লোকের স্বার্থবুদ্ধির হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবো—'

এমনি আরো অন্তরঙ্গ কথা চল্‌তে চল্‌তে সভার কাজ শেষ হয়ে গেল! সভা ভাঙ্‌তে কর্ম্মকর্তারা ওঁকে রাজবাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন, সেখানকার লোক গাড়ী নিয়ে এসেছে। অনেকেরই সরকারী বদান্যতায় কিছু কিছু লোভ আছে, শান্তিবাবুকে ধরে তার কোন ব্যবস্থা হ'তে পারে কিনা জানতে চান। সেজন্য ওঁকে একটু নিভৃতে পাওয়া দরকার। রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম ও জলযোগের অবসরে তাঁরা বাইরের ভীড় সরিয়ে নিজেদের কাজ সারবেন—মনে মনে এম্‌নি আশা ক'রে আছেন। কিন্তু হঠাৎ শান্তিবাবু নিজেই দিলেন সব ফাঁসিয়ে। রাজার ম্যানেজারকে বললেন, 'দেখুন, এখন ত সবে রাত আটটা, আমি সাড়ে দশটা নাগাদ ঠিক রাজবাড়ী পৌছব। আপনারা অজিতকে নিয়ে চলে যান, আমি একটু অনাদির বাড়ী হয়ে যাবো।...আপনাদের কিছু ব্যস্ত হতে হবে না, অনাদিই আমাকে পৌছে দেবে'খন্—কী হে, অনাদি পারবে না?'

অনাদি এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে যেন গলে যাবার মত হ'লেন।

ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সে কী কথা—নিশ্চয়ই দেবো। কোন কিছু ভাববেন না আপনারা!'

ম্যানেজার সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তাহ'লে কখন গাড়ী পাঠাবো আপনার ওখানে—বলুন?'

অনাদিবাবুর হয়ে জবাব দিলেন শান্তিরঞ্জনই। বললেন, 'গাড়ী পাঠাতে হবে না। গাড়ী একটা ঐখান থেকেই দেখে নেব'খন্।...কিছু মনে করবেন না আপনারা, হাজার হোক্, বহুকালের পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, বোঝেন ত!'

একজন প্রায় মরিয়া হয়েই বলে উঠলেন, 'অনেকগুলো কথা ছিল স্যার আপনার সঙ্গে—আমাদের এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির কাগজপত্রগুলোও দেখাবার ছিল—'

শান্তিরঞ্জনবাবু তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠলেন, 'তার আর কি—রাত্রে হবে এখন, নিরিবিলি। আমি ত রাত সাড়ে দশটার মধ্যেই ফ্রি হচ্ছি।...তা নইলে কাল সকালেই হ'তে পারবে।...এস হে অনাদি। অজিত, তুমি ওঁদের সঙ্গে ওখানেই চলে যাও,—রাত্রে দেখা হবে, কেমন?'

অনাদিবাবুর ছোট বাড়ী, এতবড় অতিথির জন্য কোন আয়োজনও সেখানে ছিল না। সুতরাং বন্ধুত্বের সমস্ত দাবী সত্ত্বেও তিনি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি উকীল, তাছাড়া শান্তিরঞ্জনকে দেখেছেন পাঁচ-ছ বছর ধরে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই। হৃদয়াবেগে বিচলিত হবার লোক তিনি নন্—একথাটা খুব ভাল করেই জানা আছে অনাদির। এই আকস্মিক বন্ধুপ্রীতির তলায় কোন

উদ্দেশ্য আছে কিনা সেটা ঠিক করতে না পারাও বোধ হয় অস্বস্তির আর একটা কারণ।

অবশ্য সে কথাটাও বেরিয়ে আসতে দেরি হ'ল না। অনাদিবাবুর ছেলেরা ভীড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছিল, ইঙ্গিতে তাদের সরিয়ে দিয়ে আসল কথাটা পাড়লেন শান্তিবাবু, চুপি-চুপি বললেন, 'ত্থাখো হে, একটা বড় ভুল হয়ে গেছে আসবার সময়। গিন্নির সঙ্গে একটু রাগারাগি হয়েছিল, তাইতেই ওটা মিস্ করেছি। মানে ঠিক নিয়মিত নেশা করার অভ্যেস আমার নেই—তবে এই রকম বেশী স্ট্রেন্ হ'লে বা মন-টন খারাপ থাকলে একটু দরকার হয়। বুঝলে না?'

বুঝতে পেরেছিলেন অনাদিবাবু ভূমিকাতেই, কিন্তু ব্যাপারটা তখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই তিনি চেয়ে রইলেন বন্ধুর মুখের দিকে। শান্তিবাবু বললেন, 'পাওয়া সব জায়গাতেই যায়, তবে কি জানো, এমন একটা পোজিশন্ দাঁড়িয়েছে যে কোন মতেই প্রকাশ্যে খাওয়া যায় না। জানে আমার সেক্রেটারী অজিত শুধু—কিন্তু ও কাউকে বলবে না। ব্যাগে থাকে, রাত্রে বার ক'রে ওষুধের মত খাই, কাকে-বকে টের পায় না। আজই হয়েছে বড় মুস্কিল।'

শান্তিরঞ্জনবাবু অসহায়ভাবে চাইলেন অনাদিবাবুর মুখের দিকে। অনাদিবাবু একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'আমার বাড়ীতে ওসব পাট নেই—এই হয়েছে মুস্কিল। দোকানও সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, অবিশ্যি তার জন্যে আটকাতনা। কিন্তু এতরাত্রে কিনতে গেলেই আসল কথাটা ফাঁস হয়ে পড়বে যে। তুমি আসবার ফলে এমন অবস্থা হয়েছে যে সবাই তোমার দিকে চেয়ে আছে—চারিদিকে সজাগ চোখ। এমন কি আমার বাড়ী এসেছ, জানলা

দিয়ে ছাখো গলিতে কত লোক অপেক্ষা করছে। চারদিকে এতগুলো লোক এড়িয়ে যাই কি ক'রে?'

শান্তিবাবু ক্রমেই অসহিষ্ণু এবং বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। সত্য কথা বলতে কি অনাদির সঙ্গে তিনি এত আগ্রহ করে পুরোনো আলাপ ঝালিয়েছিলেন শুধু ঐ জন্যেই। অনাদি বরাবরই ফন্দীবাজ এবং চাপা —ওঁর শরণাপন্ন হ'লে উপায় একটা হবেই, আর কথাটাও গোপন থাকবে এই ছিল তাঁর আশা। এখন অনাদিবাবুর কথায় একটু যেন শুষ্ক কণ্ঠেই শান্তিবাবু জবাব দিলেন, 'অবিশ্যি আমার এমন কিছু অভ্যেস নয় যে না হলেই চলবে না। তবে থাক, আমি উঠি!'

ভাবটা এই—যেন অনাদিবাবু এতক্ষণ ধরে তাঁকে প্রচণ্ড ধাপ্পা দিয়ে এসেছেন। অনাদিবাবু কথাটা বুঝলেন। বললেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও হে, ব্যস্ত হয়ো না। মতলব একটা ভাঁজতে হবে বৈকি!'

তারপর তিনি মুহূর্ত্ত-কয়েক উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে শান্তিবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'হয়েছে।...কাজটা সারতে হবে অথচ কেউ সন্দেহ পর্য্যন্ত করবে না—এইত তোমার ইচ্ছা? আচ্ছা, একটা কথা। বস্তুটা চাই—কিন্তু স্থানটা সম্বন্ধে তোমার কোন প্রেজুডিস্ নেই ত?'

'অর্থাৎ—?'

'মানে এই শহরেই একটি স্ত্রীলোকের বাড়ী যদি ব্যবস্থা করি? তোমাকে তার চেনবার কোন সম্ভাবনা নেই।' পরিচয় দিলে হয়ত চিনবে, কিন্তু পরিচয় যদি না দিই? তার ওখানে সম্ভবত সব ব্যবস্থাই আছে, নয়ত সে-ই সব করে দেবে। আধঘণ্টার ত মামলা—দোষ কি?'

'দোষ? কিছু না, কোন প্রেজুডিস নেই। ব্যাপারটা গোপন থাকলেই হ'ল—'

'তা থাকবে।' আশ্বাস দিয়ে অনাদিবাবু উঠে পড়লেন; জামাটা গায়েই ছিল; গৃহিণীকে কী একটা কাজের অজুহাত দিয়ে খুব চুপি চুপি খিড়কী দোর দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পিছনের একটা গলিতে। বড় রাস্তায় যাবার উপায় নেই—সত্যিই তখনও অসংখ্য লোক সেখানে অপেক্ষা করছে, কখন শান্তিবাবু বেরোবেন এই আশায়।

এসব গলিপথে, বিশেষত মফস্বলের, হাঁটার অভ্যাস বহুকাল শান্তি-বাবুর নেই। প্রত্যেকটি পদক্ষেপে হোঁচট খান—কাদা জুতো ডিঙিয়ে পায়ের ওপরে এসে লাগে—মিহি খদ্দরের কোঁচা কাদায় মাখামাখি হয়। বিরক্তি তাঁর কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলে ওঠে। বিরক্তি নিজের ওপর। বাইরের সম্মান এবং অন্তরের কদর্য্য পিপাসা এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে চিরদিন তাঁকে এম্নি ভুগতে হয়েছে। কী প্রয়োজন ছিল অনাদিকে এসব কথা বলার, আর এই অন্ধকারে এমন ক'রে বেশ্যাবাড়ী যাওয়ার? ছি, ছি!

একবার ভাবলেন ফিরেই যাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল এ পিপাসা তাঁর ট্রেণ থেকেই পেয়ে আছে। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া এই উপলক্ষ্য ক'রেই। ইদানীং এ পিপাসা তাঁর বেড়ে যাচ্ছে যেন দিন দিন—আগে ছিল সত্যিই ওষুধের মাত্রা—এখন সেটা আটগুণ হয়ে উঠেছে। এমন ক'রে চললে বেশী দিন আর গোপন রাখা চল্‌বেনা তা তিনিও বুঝতে পারছেন; তবু পারেন না নিজেকে সামলাতে। স্ত্রী আজ বোতল ফেলে দিয়েছেন রাস্তায়—শেষ মুহূর্ত্তে সংবাদটি জানতে পেরেই বচসার সৃষ্টি হয়—তখন আর সময়ও ছিল না।

কিন্তু এ রাস্তা যে প্রতি মুহূর্ত্তেই অসহ্য হয়ে উঠছে। তিনি চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন, 'একটা গাড়ী নিলে হ'ত না? অনাদি?'

অনাদি বললেন, 'গাড়ী নিলেই ত বড় রাস্তায় বেরোতে হবে হে!…তোমাকে না চেনে কে? বিশেষ এমন সন্দেহজনক ভাবে চুপি চুপি রাস্তায় বেরোনো—এ যদি একটা আট বছরের ছেলেও দেখতে পায় তাহ'লে আর রক্ষে থাকবেনা, সঙ্গে সঙ্গে শহরময় রাষ্ট্র হয়ে যাবে—'

তা বটে! তবে অনাদিই একটু পরে ভরসা দিলেন, 'আর বেশী দূর নয়, ঐ সামনের গলিটা—'

'যার ঘরে নিয়ে যাচ্ছ, সেখানে লোকজন থাকবে না ত?'

'বোধহয় না। কারণ—কারণটা অবিশ্যি তোমাকে বলতে বাধা নেই—আমারই আজ সেখানে যাবার কথা!'

বলতে বলতেই তাঁরা এসে পড়লেন। ছোট্ট পুরোনো বাড়ী—পাড়াটাও ঠিক বেশ্যাপল্লীর মত নয়—খুব নিস্তব্ধ। অনাদি বুঝিয়ে বললেন, 'ঠিক সাধারণ বাজারের মেয়েছেলে নয় তাহলে কি আর তোমাকে আনতে পারি! এই আমরা দু-একজন আসি মধ্যে মধ্যে, বুঝলে না?'

কড়া নাড়তেই একটি ঝি এসে দোর খুলে দিলে। তার কানে চুপিচুপি কী বলে দিলেন অনাদিবাবু। সে ঘাড় নেড়ে নিমেষে উপরে উঠে গেল। ওঁরাও মিনিট-খানেক নীচেই অপেক্ষা করে সংকীর্ণ ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে গেলেন। সিঁড়ির সামনেই যে ছোট ঘরখানা তাতে ঢালা ফরাস বিছানো রয়েছে। শুভ্র শয্যা, পরিষ্কার তাকিয়া। চকচকে পিতলের ছাইদানি, একটি সিগারেটের টিন ও দেশলাই।

দেওয়ালের ছবির মধ্যে দেশ-নেতাদের ছবিই বেশী, একটি মাত্র ক্যালেণ্ডার, তাতেও সুভাষচন্দ্রের ছবি। এক কথায় সর্ব্বত্র একটা সুরুচি ও শিক্ষার ছাপ। এত কষ্টের পর যে বিরক্তি জমেছিল শান্তি-রঞ্জনবাবুর মনে—ঘরে ঢুকেই যেন নিমেষে তা চলে গেল, তিনি একটা আরামসূচক ধ্বনি ক'রে তাকিয়ার ওপর গা এলিয়ে দিলেন।

'বসো হে অনাদি'—বলে তিনিই আবার প্রসন্ন মুখে একটা তাকিয়া এগিয়ে দিলেন।

একটু পরে ঝি এসে পরিষ্কার দুটো গ্লাস, সোডার এবং মদের বোতল সাজিয়ে দিয়ে গেল। ওঁরা পেশাদার মাতাল নন্—চাটের প্রয়োজন নেই, তা বোধহয় গৃহকর্ত্রী আগেই অনুমান ক'রে নিয়েছেন, কারণ সে রকম কোন চেষ্টাই দেখা গেল না।

অনাদিবাবুই বোতল খুলে গ্লাসে বস্তুটি প্রস্তুত করে শান্তিবাবুর সামনে ধরলেন। তিনি সেটা এক নিঃশ্বাসে পান করে একটা আরামের শব্দ করে বললেন, 'কিন্তু কৈ, মালিকানকে দেখ্‌ছি না যে!'

অনাদিবাবু একটু হেসে বললেন, 'আমিই বারণ করেছিলাম, তুমি কি মনে করবে এই ভেবে। দেখতে চাও?'

'নিশ্চয়ই। বাঃ, তাঁর বাড়ী উপদ্রব করে গেলুম, তাঁকে ধন্যবাদ জানাবো না? আর তাতে দোষ কি? তবে—' গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, 'পরিচয় দেবার দরকার কি?'

'কিছু না, কিছু না! আমি ডাকছি ওকে'—অনাদিবাবু গলাটা একটু চড়িয়ে ডাক দিলেন, 'শৈল, শৈল!'

মধুর বামাকণ্ঠে উত্তর এল, 'এই যে, যাই।'

শৈল!

শান্তিরঞ্জনবাবুর কুয়াসাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে নামটা যেন কী একটা অদ্ভুত আঘাত করল। নামটা যেন পরিচিত, যেন কি একটা বেদনার সঙ্গে নামটা জড়িয়ে আছে তাঁর হৃদয়ে।

একটু পরেই শৈলবালা এসে দাঁড়াল দ্বার-প্রান্তে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের ছিপছিপে তরুণী, চেহারায় অসাধারণত্ব কোথাও নেই—শুধু দুটি চোখ ছাড়া। চোখ দুটি বড়, কিন্তু বড় চোখ আরও আছে—দৃষ্টিটাই আশ্চর্য্য! গভীর এবং তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল সে চাহনি চোখের মধ্যে দিয়ে সোজা যেন অন্তরে প্রবেশ করে। সে চোখ সহজে ভোলা যায় না—

অকস্মাৎ শান্তিরঞ্জনবাবু সোজা হয়ে বসলেন। মদের প্রভাব আর নেই, সমস্ত বিস্মৃতি পার হয়ে ঐ দুটি চোখ তাঁরও অন্তরে প্রবেশ করেছে। এ চাহনি ভোলবার নয়। আজ তাঁর যা কিছু প্রতিষ্ঠা, যা কিছু অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি সমস্ত ব্যর্থ মূল্যহীন বলে বোধ হয় যখন এই দুটি চোখের কথা কোন কর্ম্মহীন মুহূর্ত্তে তাঁর মনে পড়ে যায়।

আর শৈল?

শৈলও একবার মাত্র তাঁর দিকে চেয়ে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। ওর চোঁখে পলক নেই, দেহের কোন অংশ বিন্দুমাত্র নড়ছে না। কপাটটা ধরে, স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে—শান্তিরঞ্জনবাবুর মনে হল যেন যুগ-যুগান্ত ধরে, যেন বহু কল্প ধরে—সময়ের সংখ্যা-গণনার অতীত কোন কাল ধরে!

অবশেষে অনাদিবাবুই এক সময়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি চিন্‌তে নাকি ওকে? মানে আমাদের শৈলকে?'

হ্যাঁ।' চিনতেন বৈ কি! এ একরকম অদৃষ্টের পরিহাসই বলতে হবে। একদা এই মেয়েটিকে ভোলবার জন্যই তিনি একটু একটু মদ

খেতে শুরু করেছিলেন, আজ যে সেই মদ খাওয়ার নেশাই তাঁকে আবার এই মেয়েটির কাছে টেনে নিয়ে আস্‌বে তা কে ভেবেছিল?

শান্তিরঞ্জনবাবু অনাদির কথার জবাব দিলেন না, চেয়েই রইলেন শান্তির দিকে—উদ্‌ভ্রান্ত রক্তাভ দৃষ্টি মেলে। মন তাঁর বর্ত্তমান ছেড়ে বহু বৎসর ডিঙিয়ে চলে গিয়েছিল তাঁর কৈশোরে—যখন মেয়েটি বালিকা, এদের বাড়ীতে থেকে শান্তিরঞ্জনবাবু ইস্কুলে পড়েন, যখন এই শৈলর দাদার পরিত্যক্ত জামা গায়ে দিয়ে তাঁর লজ্জা নিবারণ হয়।

সে অনেকদিনের কথা কিন্তু ভোলবার কথা নয়। শান্তিরঞ্জন বাবুর কেউ ছিল না আপনার বলতে। এক দূর-সম্পর্কের মামা তাঁকে মানুষ করেছিলেন, তারপর তিনিই কলকাতায় তাঁর বন্ধুর কাছে অর্থাৎ শৈলর বাবার কাছে পাঠিয়ে দেন। শৈলর বাবার অবস্থা সেদিন খুব ভাল ছিল না, সাধারণ কেরাণী—কলকাতায় বাড়ী ভাড়া দিয়ে থাকতে হ'ত, তবু বন্ধুর অনুরোধ সেদিন তিনি এড়াতে পারেন নি। একটি অনাথ বালক সামান্য একটু সাহায্য করলে যদি লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারে ত হোক—তাঁর না হয় তাতে একটু কষ্টই হবে। শান্তির মামা মাসে পাঁচটি করে টাকা পাঠাতেন, তাতে কলেজের মাইনেটাও পুরো হ'ত না—বাকী সব খরচাই দিতে হ'ত শৈলর বাবাকে। অবশ্য আই-এ পাশ করার পর থেকে টিউশ্যনী করে শান্তিরঞ্জন কিছু কিছু উপার্জ্জন করেছেন, এম-এ, আর ল পড়বার সব খরচই তিনি নিজে চালিয়েছেন। তবু নিরাপদ আশ্রয় এবং আহারের মূল্যই কি সে দিন কম ছিল?

আর তার চেয়েও যেটা বড় কথা ছিল সেদিন—সেটা এঁদের স্নেহ। শৈলর মা কোন দিন শান্তিরঞ্জনকে নিজের ছেলেমেয়েদের থেকে তফাৎ করে দেখেন নি—বরং বরাবর ওকে নিজের বড় ছেলেরই সম্মান

দিয়ে এসেছেন। কোন দিন—কৃতজ্ঞতা মন থেকে কাটাবার জন্য নির্জ্জন অবসরে শান্তিবাবু যতই যুক্তি আনবার চেষ্টা করেন—শৈলর মায়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও তিনি মনে করতে পারেন নি। ওর বাবার ত কথাই নেই, নির্ব্বিরোধী দেবতুল্য লোক ছিলেন তিনি। অফিস ও খবরের কাগজ, এ ছাড়া কোন ব্যসন, কোন নেশা ছিল না—সংসারের কোন খবরই রাখতেন না। কিন্তু সে সব কথা ছাড়িয়ে মনের অন্ধকারতম প্রদেশে যে উজ্জ্বল দীপশিখাটি অমর হয়ে আছে সে হচ্ছে এই মেয়েটির ভালবাসা। কী যত্নই করেছে এই শৈল, তাঁর নিজের বোন থাকলেও করতে পারত কিনা সন্দেহ। কত ফরমাস, কত অন্যায় আদেশ, কত জুলুম সেদিন এই মেয়েটি নিঃশব্দে হাসিমুখে সহ্য করেছে। কোন দিন তাঁর প্রয়োজনীয় কোন জিনিস খুঁজতে হয়নি—ঠিক সময়ে প্রস্তুত রেখেছে। অধিকাংশ সময়েই প্রয়োজনের কথাটা থেকেছে ওঁর মনে, সে শুধু ওর চোখের দিকে চেয়ে কাজটা করে গেছে। এত শান্ত, এত কর্ম্মঠ, এত মধুর প্রকৃতির মেয়ে আর তাঁর চোখে পড়েনি—সেদিনও না, তার পরেও না।

শৈল ছিল বাড়ীর ছোট মেয়ে। ওর দিদির বিয়ে হ'ল শান্তিবাবু কলকাতায় আসার পরেই। দাদা তখন ইস্কুলে পড়ে, ওরা সবাই শান্তিবাবুর চেয়ে ছোট—শৈলর মা তাই সকলের কাছেই পরিচয় দিতেন, 'এইটি আমার বড় ছেলে!' সেদিন শৈলর সম্বন্ধে কোন কথা ভাবা সম্ভব ছিল না, কিন্তু শান্তিরঞ্জন বাবু যেমন একটার পর একটা পাস করে উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন শৈলও তেমনি একটু একটু করে পা দিতে লাগল কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের দিকে। অবশেষে এমন একটা সময় এল যখন ঐ সম্ভাবনাটার দিকে

শুধু অন্য লোকেরাই পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে ইঙ্গিত করতে লাগল না—সম্ভাবনাটা বার বার শান্তিরঞ্জনের মনেও উঁকি মারতে লাগল। যদি তা হত—যদি শৈলকে তিনি সেদিন বিবাহ করতেন তাহ'লে তিনি যে সুখী হতে পারতেন তাতে কোন সন্দেহ তাঁর মনে কোন দিনই ছিল না। কিন্তু সুখ সেদিন খুব তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল—তাই সেদিক থেকে মনকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন জোর করে। পরের বাড়ী, পরানুগ্রহে মানুষ হয়েছিলেন তিনি, দৃষ্টি ছিল তাঁর নিজের উন্নতির দিকে, চোখের সামনে আঁকা ছিল সেদিন সুখ নয়—প্রতিষ্ঠা। গরীব কেরাণীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে তাই নবীন উকীলের জীবনকে বিড়ম্বিত করতে সেদিন তিনি রাজী হননি, বিশেষ যে নতুন পাশ-করা উকীলের মাথার ওপর কেউ নেই। তিনি চেষ্টা করে, তদ্বির করে ধনী ও বিখ্যাত ব্যবহারজীবীর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। সে মেয়ে কুরূপা, মুখরা, তাকে নিয়ে সুখী হতে পারেননি তিনি একদিনও, কিন্তু তাঁর হিসেবে ভুল হয়নি। পসার, অর্থ, প্রতিপত্তি, যশ—এ তিনি অঞ্জলি পুরে পেয়েছেন,—কল্পনার অতীতরূপে।

আর শৈল?

শৈল একটি কথাও বলেনি, হাসিমুখে নিজেই সে পাত্র সাজিয়ে দিয়েছে, তবু সেদিন শান্তিরঞ্জনবাবুর বুঝতে দেরী হয়নি যে শুধু বাইরের লোকের মনে নয়, শৈলর নিজের মনেও একটা আশা, একটা প্রস্তুতি ছিল—আর সে আশা যে কতখানি, তা তার মুখের সুগভীর বেদনার ছায়া দেখে অনুমান করে নিতেও অসুবিধা হয়নি। তা হোক্—ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর শান্তিরঞ্জন তার জন্য নিজের কর্ম্মপ্রণালী একটুও বদলানো আবশ্যক বোধ করেন নি। এক কথায়

এতদিনের প্রিয় ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে ঘরজামাইরূপে ধনী শ্বশুরের ঘরে এসে উঠেছিলেন। এমন কি শৈলর বাবার অনুরোধেও (ওর মা তখন পরলোকে) ফুলশয্যাটা এ বাড়ীতে করার কথাটা শ্বশুরের কাছে তুলতে পারেন নি। ধনী কন্যা পাছে তাঁর পূর্ব্ব-জীবনের পারিপার্শ্বিকটা দেখে তাঁর সম্বন্ধে কোন হীন ধারণা করেন—বোধ করি এই ছিল তাঁর ভয়।

এরপর এ বাড়ীর সংবাদ রাখার সময় তাঁর হয়নি। কারণ ঠিক ধনী শ্বশুরের জামাতারূপে নিজেকে পরিচিত করতে বা নিশ্চিন্ত কীর্ত্তিহীন জীবন-যাত্রার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে তিনি চান্‌নি। এই অবস্থাটাকে বেছে নিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপানরূপেই শুধু, তাই পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়েছিল দস্তুরমত। একধারে ওকালতি অন্যধারে রাজনীতি দুটোকে তিনি একসঙ্গে বেছে নিয়েছিলেন এবং দুটোতেই পসার জমিয়ে তুলেছিলেন প্রায় একসঙ্গে, সুতরাং যা নিতান্ত হৃদয়ের দিক, কৃতজ্ঞতায় দিক, যা আছে শুধু ইতিহাসে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ-সুবিধা তিনি পাননি। শুধু যখন কোন এক শ্রান্ত, নির্জ্জন মুহূর্ত্তে ক্ষুধার্ত্ত অন্তর হাহাকার ক'রে উঠত তখনই কেবল মনে পড়ত এই শান্ত, শুদ্ধ, কল্যাণময়ী, সেবারতা মেয়েটির কথা, যে নিজের অন্তরের সমস্ত মাধুর্য্য নিয়ে নিঃশব্দে একদিন অপেক্ষা করছিল, যাকে নিলে তিনি জীবনের জয়যাত্রার পথে পিছিয়ে পড়তেন হয়ত কিন্তু সুখী হ'তে পারতেন !

আজ এতদিন পরে, এইভাবে, এইখানে শৈলর সঙ্গে দেখা হওয়াটা এমনই অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে শান্তিরঞ্জনবাবু স্তম্ভিত ভাবে, চেয়েই

রইলেন। আঘাত পেলেন কিনা সেটাও তাঁর আচ্ছন্ন মস্তিষ্ক ভাল করে বুঝতে পারলো না—শুধু অতীত দিনের কথাগুলি, সুখে দুঃখে মাখানো সহস্র স্মৃতিঘেরা দিনগুলি যেন বিদ্যুতের গতিতে চোখের সাম্‌নে দিয়ে সরে সরে গেল। এই মেয়েটির সঙ্গ-মাধুর্য্য-মাখানো স্বপ্নময় দিনগুলি—আর তার সঙ্গে তার অভাবে বিবর্ণ, বিস্বাদ অথচ ঐশ্বর্য্যময় দিনগুলির কথা একই সঙ্গে তাঁর মনোদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে তাঁকে বিহ্বল, জড় করে দিয়ে গেল।

অবশেষে এক সময় তাঁর স্খলিত কণ্ঠ ভেদ ক'রে স্বর বেরোল, 'শৈল, তুমি ?'

শৈলর পাষাণ-প্রতিমার মত স্থির নিশ্চল মূর্ত্তিতে সেই কথাটার আঘাত অকস্মাৎ যেন প্রাণ সঞ্চার করলে। সে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে একবার প্রাণপণ চেষ্টায় নড়ে চড়ে উঠল—তারপর নিজেকে আশ্চর্য্য রকম মানসিক জোরে সাম্‌লে নিয়ে ঘরের মধ্যে এগিয়ে এল। আলোয় আস্‌তে আর একবার ভাল করে চেয়ে দেখলেন শান্তিরঞ্জন বাবু, সেই মুখ, তেমনি কমনীয়, শুধু বয়সের একটা ছাপ পড়েছে মাত্র। আর বোধ হয়, এই মাত্রকার এই আঘাতের চিহ্নস্বরূপই, মুখে একটা অপরিসীম পাণ্ডুর আভা !

আবার তিনি মোহগ্রস্তের মত আচ্ছন্নভাবে প্রশ্ন করলেন, 'শৈল, তুমি, তুমি এখানে !'

এবার শৈল নিজেকে আরও সাম্‌লে নিয়েছে। বরং মুখের পাণ্ডুরতা কেটে গিয়ে একটু একটু ক'রে সে মুখ হয়ে উঠ্‌ছে কঠিন। সে এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠেই বললে, 'হ্যাঁ বড়দা, আমি।'

কণ্ঠস্বর, সহজ করবার প্রাণপণ চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও শেষের দিকে যেন কেঁপে গেল।

শান্তিরঞ্জনবাবু মাথা নামালেন। কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ; শুধু দেওয়ালের ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই বাড়ীটার কোথাও।

তারপর, অনেক—অনেকক্ষণ, বোধ হয় এক যুগ পরে অনাদিবাবু বলে উঠলেন, 'তোমরা পরস্পরকে আগে থাকতেই চিন্‌তে তাহলে, আশ্চর্য্য!'

কেউ জবাব দিলে না। আরও খানিক পরে শৈল, যেন কতকটা চুপি-চুপিই বললে, 'উনিই যে এখানে আসবেন তা আমি আপনার মুখে নামটুকু শুনেই বুঝেছিলাম অনাদি বাবু, কিন্তু আপনার সঙ্গে যে পরিচয় আছে তা ভাবতে পারিনি। বিশেষ উনি যে আমার বাড়ীতে আসবেন—' মাঝপথেই সে থেমে গেল কথা বলতে বলতে, যেন লজ্জায় তার গলা বুজে এল; এ লজ্জা নিজের অধঃপতনের জন্যই শুধু নয়, তার প্রথম যৌবনের স্বপ্ন যে প্রিয়তমকে ঘিরে রচিত হয়েছিল তার অধঃপতনের জন্যও বটে।

এবার শান্তিরঞ্জনবাবু কথা কইলেন, কেমন একটা বিকৃত ভগ্ন কণ্ঠে যেন কতকটা অপরাধীর মতই বললেন, 'বাবা মারা গিয়েছিলেন এ খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের ঠিকানাটা মিস্ করি ব'লেই যাওয়া হয়ে ওঠেনি।'

'তোমাকে ত আমরা আশাও করিনি বড়দা!'

ওর শান্ত কণ্ঠস্বর যেন চাবুকের মতই আঘাত করলে শান্তিরঞ্জনকে, তবু তাঁকে প্রশ্ন করতে হল। অনুতাপ আর কৌতূহল তাঁকে স্থির

থাকতে দিচ্ছিল না। তিনি বললেন, 'কিন্তু বাবা কি তোমার বিয়ে দিয়ে যেতে পারেন নি ?'

'না। যখন কথা চলছে সেই সময়েই দিদি বিধবা হয়ে ফিরে এলেন কিনা।'

'দিদি বিধবা হয়েছেন ?' কতকটা আর্ত্ত-কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'হ্যাঁ—তিন-চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। সেই আঘাতেই বাবা আমার বিয়ের প্রস্তাব বন্ধ রাখেন। তা ছাড়া খরচাও ত বাড়ল। জামাইবাবু কিছু রেখে যেতে পারেন নি।'

আবার সবাই চুপচাপ—যুগান্ত-ব্যাপী নীরবতা যেন। শুধু সেই ঘড়িটার টিক্‌টিক্‌ শব্দ।

'পূর্ণ কোথায়, কি করছে ?' শান্তিবাবু প্রশ্ন করেন।

'দাদা ? দাদা ত্রিশ সালের দাণ্ডি অভিযানের সময় নুন তৈরী করতে গিয়ে জেলে গেল। জেল থেকে যেদিন বেরোল সেই দিনই তাকে আটক করা হ'ল তিন আইনে। একেবারে এই গত বছর ছাড়া পেয়েছে সে, তাও এনেছে যক্ষ্মা। অনেক টাকা খরচ করে একটু সুস্থ করে তুলেছি—কিন্তু বাঁচাতে পারবনা বোধ হয়।'

তারপর একটু থেমে, বোধ করি নিজেকে সংযত ক'রে নিয়েই সে আবার বললে, 'আর সে বাঁচতে চায়ও না। মাথাও তার কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, খবরের কাগজ বিক্রী ক'রে যা পায় সবটা দিয়ে আসে কংগ্রেস ফণ্ডে—নিজের টাকার দরকার হ'লে অম্লান বদনে আমার কাছে এসে হাত পাতে। আমি টাকাটা কোথা থেকে কী ক'রে দিচ্ছি তা একবার ভাবেও না !'

অস্ফুটকণ্ঠে শাস্তিরঞ্জন বাবু প্রশ্ন করলেন; 'আর দিদি ?'

'ওঁরাও এখানেই আছেন, অন্য বাড়ীতে। ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে পড়ে।'

এবার অনাদিবাবুই বাকী সংবাদটা জুগিয়ে দিলেন, গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন, 'শৈল নিজেও খুব ভদ্রভাবেই থাকে। ওর দিদি আর ও উপোস করেও সহ্য করেছে সব। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যখন অনাহারে মরতে বসল তখন মরিয়া হয়ে ও চলে এল এইখানে—এখানে কেউ চিনবে না এই ছিল ওর সান্ত্বনা। নিজের কাঁধে তুলে নিলে ও কলঙ্ক, অনাচারের বোঝা; কিন্তু দিদিকে কোন কালি স্পর্শ করতে দিলে না। তবে প্রথম থেকেই আমাদের দু-এক জনের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল বলে খুব নীচে ওকে নামতে হয়নি। আমরা কয়েকজন মাত্র এখানে আসি, তাও গোপনে। ও যে কী ছিল তা ত ওর সঙ্গে কথা কইলে, ওর দিকে তাকালেই বোঝা যায় শাস্তি, ওকে অসম্ভ্রম কি কেউ করতে পারে!'

শাস্তিবাবু জবাব দিলেন না। মাথা হেঁট করে পাথরের মত স্থির হয়ে বসে রইলেন। একটু পরে শৈলই একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'যে জন্যে এখানে এলে তা ত পড়েই রইল বড়দা, খাও। তবে আমি আর ওটা হাতে করে তোমাকে ঢেলে দেব না।'

একটা যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে থেকে জেগে উঠে শাস্তিবাবু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'থাক্—ওসব ভাল লাগছে না।' আচ্ছা, আমি এবার উঠি—রাজবাড়ীতে ওঁরা সব অপেক্ষা করে আছেন। অনাদি, নীচে এগিয়ে দেখো দেখি, পথ ফাঁকা আছে কিনা—'

অনাদি ইঙ্গিত পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন, তবু দুই-এক

মুহূর্ত ইতস্তত করতে হলো শান্তিরঞ্জনকে। বারকতক ঢোঁক গিলে প্রশ্ন করলেন, 'এখান থেকে কোথাও যেতে চাও শৈল?'

'না। দরকার কি?'

ওর সেই আশ্চর্য্য চোখ দুটি মেলে বিস্মিত হয়ে তাকাল সে শান্তিবাবুর দিকে।

অপরাধের বোঝা ভারি হয়ে উঠছে বুঝেও মরিয়া হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আমার কাছ থেকে কি আর কোন সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয়? তোমার বোন্‌পো বোন্‌ঝিদের ভারও কি নিতে পারি না?'

'না বড়দা,। তোমার কাছ থেকে কিছুই নিতে পারব না, মাপ করো।'

শান্তকণ্ঠেই উত্তর দেয় শৈল।

অগত্যা শান্তিরঞ্জনকে উঠতে হলো। কিন্তু দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন, পকেট থেকে একখানা একশ' টাকার নোট বার করে তিনি শৈলর হাতটার মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'দাবী করবার কিছু নেই জানি শৈল, সে অপরাধ আর বাড়াব না। তবে বড়দা নয়—অনাদির বন্ধুর কাছ থেকেও ত এটা নিতে পারো?'

অকস্মাৎ যেন শৈলর চোখে আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র, পরক্ষণেই মুখের ভাব আবার তেমনি শান্ত হয়ে গেল, শুধু মনের মধ্যে যে ঝড় উঠেছিল তার চিহ্ন রইল গলার আওয়াজে। গাঢ় কণ্ঠে সে উত্তর দিলে, 'যখন এ পথে এসেছি তখন এ টাকা ফেরৎ দেবার অধিকারই বা কোথায় বড়দা! তবে এতদিন পরে যখন দেখা হ'ল তখন একটি ভিক্ষা তোমাকেও আজ দিতে হবে—শুনেছি তুমি দেশের নেতা হয়েছ, আমি তোমার হাত দিয়ে এ টাকাটা

দেশের কাজেই দিতে চাই। এ যে আমার পাপের টাকা নয়—যদি প্রয়োজন হয়-ত তুমিই বলতে পারবে। তা ছাড়া পূজায় সকলেরই অধিকার আছে, নয় কি?'

সে গলায় আঁচল দিয়ে আর একবার ওঁকে প্রণাম করলে।

শেষ